প্রসাদ সেনগুপ্ত

চলমান দেশ

ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা ● ● ● ১৯৮১

চলমান দেশ

শ্রীপ্রসাদ সেনগুপ্ত

ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা ● ● ● ১৯৮১

ভূমিকা

এই বইয়ের আলোচনার বিষয়—Continental Drift, এটিকে ভূ-বিজ্ঞানের একটি শাখা বলে মনে করা যায় ; কারণ—পৃথিবীর গঠন ও আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া-কলাপ নিয়েই এর মূল কাজ। বহু বিজ্ঞানীর সংগ্রহ করা বহু তথ্যে আর প্রকাশ করা বহু তত্ত্বে আর বিতর্কে এই বিষয়টি এতই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে যে—একে এখন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শাস্ত্র ব'লে গণ্য করলেও ক্ষতি নেই। এই বই যেহেতু এই বিষয়ের প্রথম পাঠকের জন্য লেখা, তাই বিতর্ক যতদূর সম্ভব বাদ দেওয়া হয়েছে। পারিভাষিক শব্দ নিতান্ত প্রয়োজন না-হ'লে উল্লেখ করা হয় নি। বিদেশী নামের ভীড়ও খুব বাড়াইনি। বরং মূল ব্যাপারটি যথাসাধ্য পরিষ্কারভাবে তুলে ধরার চেষ্টাই করেছি। আগ্রহী পাঠকের বিস্তৃততর পাঠের জন্য সবশেষে একটি ক্ষুদ্র নির্দেশিকাও দেওয়া আছে।

পাঠককে একটা কথা গোড়ায় জানিয়ে রাখা দরকার। সত্যিকার 'অজ্ঞ' (layman) পাঠকের জন্য সরল বিজ্ঞান-গ্রন্থ এখন আর লেখা হয় না ; লেখা সম্ভবও নয়। বিজ্ঞানের বিভিন্ন স্বতন্ত্র শাখার সীমারেখা লুপ্ত হয়ে একের এলাকা অন্য অনেকের সঙ্গে মিশে গেছে, এবং এক বিষয়ের কথা বলতে গেলেই অন্য অনেক বিষয়ের, কথা এসে যায়। কাজেই গোড়ায় কিছু জানা না থাকলে আজকাল কোনো বইই নিজে নিজে পড়া যায় না। তবে, এই অসুবিধার পরিমাণ বিষয়বস্তু অনুসারে কম বা বেশী হয়। বর্ত্তমান বিষয়বস্তু সেই হিসাবেই নির্বাচন করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে আলোকচিত্র ব্যবহারের খুবই দরকার ছিল, যদিও নানা কারণে তা' সম্ভব হ'ল না। তবে, রেখা-চিত্র ব্যবহারে কোনো কৃপণতা করা হয়নি। এবং, মফঃস্বলে উপযুক্ত শিল্পীর অভাবে নিজেকেই ঐ ভূমিকায় নামতে হয়েছে। অঙ্কন-অক্ষমতা মার্জনীয়।

দশ বছর আগে এই বিষয়ে 'রবিবাসরীয় আনন্দবাজার' পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় আলোচনা করেছিলাম বিক্ষিপ্তভাবে। এখন বিস্তৃততর এবং আধুনিকতর রূপে ঐ আলোচনা করা গেল বর্ত্তমান প্রকাশকের আগ্রহে।

কুচবিহার ;
ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১

প্র. সেনগুপ্ত

সংশোধনী

ছবি নং ২ কভারে ঠিকমত বসানো আছে।

পৃঃ ৯ উপর থেকে ১৩ লাইনে নমুদ্র হবে সমুদ্র
পৃঃ ২৯ ,, ১২ ,, ভূমিকল্পের হবে ভূমিকম্পের
পৃঃ ২৯ ,, ১১ ,, কমা (,) বাদ হবে
পৃঃ ২৯ নীচ থেকে ৫ লাইনে ১২ হবে ১·২
পৃঃ ৪০ ,, ৪ ,, যদি বাদ হবে
পৃঃ ৩৭ ,, ২ ,, বিধ্বস্ত হবে ভিতরে
পৃঃ ৩৬ ,, ২ ,, মাইলের ও হবে মাইলেরও
পৃঃ ৩২ ,, চিত্রনির্দেশিকায় সাদৃশতা হবে সদৃশতা

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

॥ এক ॥

বিশ্ব-মানচিত্র দেখলেই ব্যাপারটা সন্দেহ করা যাবে।

পৃথিবীর তিনভাগ জলের ভিতরে এক ভাগ জমি এক জায়গায় জমা হয়ে নেই। সেই এক-ভাগ বহুভাগে ছড়ানো-ছিটোনো।—নয়া পয়সাগুলো বাদ দিয়ে আপাতত বড় ভাগগুলোর দিকেই আমরা তাকাই—যাদের নাম মহাদেশ এবং আকারে যারা ওই মহাদেশেরই তুল্য।—এই দেশগুলোর চারপাশের সীমারেখা আঁকা-বাঁকা,

ছবি—১
আধুনিক বিশ্ব-মানচিত্র

এবড়ো-খেবড়ো। স্বাভাবিক! দেশের সীমানা তো শিল্পীর হাতের কাঁচিতে কাটা নয়! সমুদ্রের জল যেমন করে তাদের ঘিরে রেখেছে, সেই হিসাবেই তাদের সীমানা।—তা হোক। মানচিত্রটা একটু দেখলেই একটা ব্যাপার মাথায় খেলে যায়। উত্তর আমেরিকা আর দক্ষিণ আমেরিকা যদি আফ্রিকার কাছে সরে আসে, তবে ঠিক খাপে খাপে লেগে যায়। যেন একই প্লেটের ওরা ভাঙা তিনটি টুকরো। —কেবল এখানেই সবটুকু শেষ নয়। পারস্য উপসাগরের দুই তীর লক্ষ্য করুন। মনে হয়—এশিয়ার একটা অংশ এইমাত্র ভেঙ্গে খানিকটা সরে

গিয়েছে। মাঝখানের ফাটলটাই হয়েছে পারস্য উপসাগর। একটু চাপ দিয়ে সৌদি আরবকে পূব দিকে ঠেলে দিলেই ফাটলটা জুড়ে যায়। —এশিয়া আর ইউরোপ—দুই মহাদেশ তো আজও জোড়া লেগে আছে।

এ ঘটনা কি নেহাৎ আচমকা ব্যাপার? এতগুলো দেশ-মহাদেশের সীমারেখা
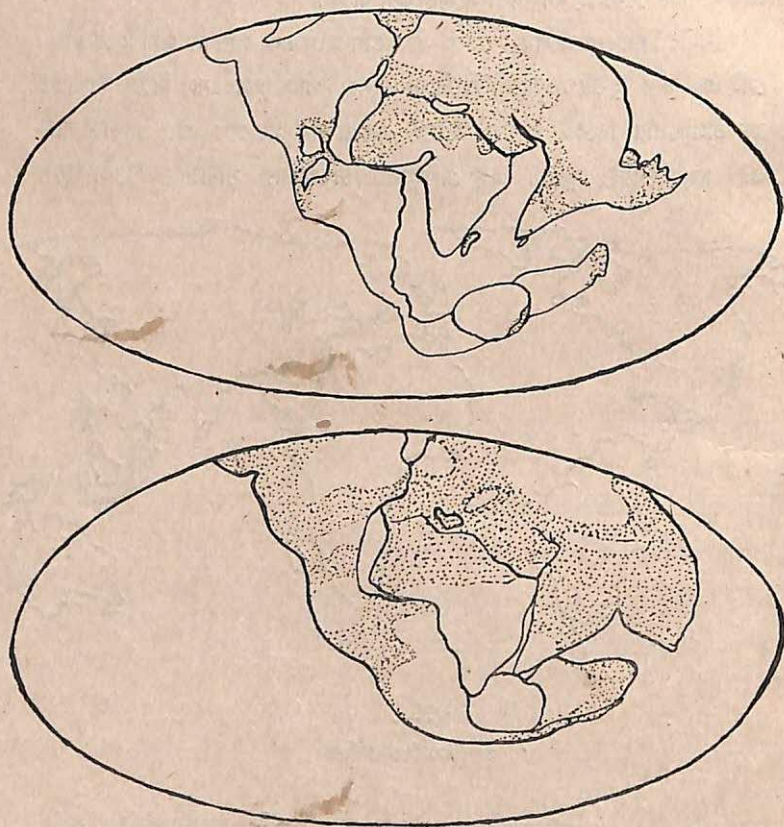
ছবি—২

আলফ্রেড ভেগেনারের দৃষ্টিতে প্রাচীন বিশ্ব-মানচিত্র। উপরের ছবিতে তিরিশ কোটি বছর, এবং নীচের ছবিতে আট কোটি বছর আগের অবস্থা দেখানো হয়েছে। ঐ সময়ে স্থলভাগের অনেকাংশ অগভীর সমুদ্রে ঢাকা ছিল বলে অনুমান করা হয়। বিন্দু চিহ্নের অঞ্চল এই অগভীর সমুদ্রের এলাকা। এখন অবশ্য ভেগেনারের এই মানচিত্রের কিছু পরিবর্তন ঘটাতে হয়েছে, যদিও মূল ধারণাটা বদলায় নি।

আচমকাই কি এভাবে সৃষ্টি হয়েছিল, যাতে মনে হয় তা'রা তাদের প্রতিবেশীদের ভাঙা টুকরো ? না কি—কোনোদিন, বহু বহু যুগ আগে, সব দেশ মিলে মোটা-মুটিভাবে একটা অখণ্ড দেশ ছিল,—তারা ভেঙে গেছে, তারপর দূরে সরে গেছে ? —এ রকম ভাবনাই মাথায় আসে। ভাবতে ইচ্ছা হয়—ঘটনা ওই রকমই। কিন্তু শুধু তাই ভাবলেই রেহাই কোথায় ! কোন কার্য-কারণের সংযোগে ঐ বিপুল মহাদেশ খণ্ড খণ্ড দেশ-মহাদেশ হয়ে গেল, কেমন করে সেই বিপুলাকার দেশ সরতে সরতে কয়েক শ' কিংবা কয়েক হাজার মাইল দূরে চলে গেল—সে হিসাব মেলাতে হবে। অবিশ্বাসীদের চুপ করাতে হবে। —কাজ বড় সহজ নয়। বস্তুত, এ কাজ আজও শেষ হয় নি। যুক্তির সব ফাঁক এখনও ভরাট করা যায়নি, এবং সব অবিশ্বাস এখনও শান্ত হয় নি। এসব কাজ এখনও চলছে। কিন্তু, সব সন্দেহ আর অবিশ্বাসের পাওনা-গণ্ডা মিটিয়েও এখন একটা জায়গায় এসে বিজ্ঞানীরা দাঁড়িয়েছেন। 'চলমান দেশ' তত্ত্ব এখন স্বীকৃত। সংক্ষেপে এই সম্পর্কেই এখনকার আলোচনা।

তবু মূল আলোচনায় ঢোকার আগে আরও কয়েকটা দিক ভেবে দেখা দরকার। কেবল মানচিত্রের নক্‌শা দেখেই এতবড় একটা তত্ত্ব ফাঁদতে হবে —এ কিছু কাজের কথা নয়। আরও অনেক সূত্র ধ'রে 'চলমান দেশ'এর ধারণা আমাদের করতে হয়েছে। যেমন,—এটাও, লক্ষ্য করা গেছে ঃ আফ্রিকার পশ্চিম তীরে হীরক-খনির প্রাচুর্য। এর পশ্চিমে বহুবিস্তৃত সমুদ্র ; ক' হাজার মাইলের উপর ; তারপর দক্ষিণ আমেরিকা। এই দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর-পূর্ব তীরেও হীরক-খনির অঞ্চল। ম্যাপটা আরেকবার দেখতে হবে। আমাদের পরিকল্পনামাফিক 'বিচ্ছিন্ন' মহাদেশ-গুলোকে যদি জুড়ে দিই, আফ্রিকার পশ্চিম তীরেই ঠেকবে দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর-পূর্ব তীর। বহু সহস্র শতাব্দী আগেকার কোনো ভূ-তাত্ত্বিক কারণে এখানে হীরক-খনির সম্ভাবনা তৈরী হয়েই ছিল। তারপর বহু বহু যুগ ধরে অখণ্ড প্রাচীন দেশ খণ্ড হয়ে দূরে সরে গেছে। কিন্তু আজও তারা বহন করছে আদি-কালের মিল।...এবারে আসা যাক সুমেরু অঞ্চলে স্পিট্‌স্‌বার্জেন্‌এ। ১৯৬০ সালে একদল অনুসন্ধানী অধ্যাপক এখানে খুঁজে পেলেন ইগুয়ানোডন্‌এর পায়ের ছাপ। ইগুয়ানোডন্‌ হ'ল এক রকম ডাইনোসর। পৃথিবীতে এরা থেকেছে দশ থেকে কুড়ি কোটি বছর আগে। ইগুয়ানোডন্‌ ছিল দ্বিপদ প্রাণী ; উচ্চতা প্রায় পনেরো ফুট ; তৃণভোজী। এই বিশাল প্রাণীদের খাদ্য হিসাবে প্রতিদিনই প্রচুর গাছ লতা-পাতার দরকার হত সন্দেহ নেই। তবে, সুমেরু অঞ্চলে তারা ছিল কেমন

ক'রে! ওসব জায়গা প্রায় সারা বছর বরফে ঢাকা। গাছপালা অতি সামান্য গজায়। —এরও একটা সম্ভাব্য উত্তর এই : স্পিট্‌সৃবার্জেন্‌ অতীতে আরও দক্ষিণে ছিল,—হয়তো ইউরেশিয়ার সংলগ্ন অঞ্চল হিসাবেই। তখন সেখানে সূর্যের আলো আর গাছপালার অভাব ছিল না। পরে এই ভূমিভাগ বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে স'রে গেছে।—দৃষ্টান্ত রয়েছে এই আধুনিক যুগেও। জলহস্তী পাওয়া যায় কেবল ম্যাডাগাস্কার আর আফ্রিকায়। এই উভচর প্রাণী গভীর জলে কখনও যায় না। অল্প জল আর কাদায় এদের বাস ; এবং যতদূর জানা যায়—মূলত ডাঙা আশ্রয় করেই এরা পুরুষ পরম্পরা কাটাচ্ছে। কিন্তু, ম্যাডাগাস্কার আর আফ্রিকার মধ্যে যে আড়াইশো মাইল সমুদ্র। এই দূরত্ব সাঁতরে পার হওয়া ওদের পক্ষে সাধ্যাতীত। সুদূর অতীতে আফ্রিকা আর ম্যাডাগাস্কারের সংলগ্নতার কথা সুতরাং ভেবে দেখা যায় না কি ?

আরও ঘটনা লক্ষ্য করা যাক। —উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের সংলগ্ন কয়েকটি দেশে এক অতি প্রাচীন পর্বতের ক্ষয়িত অবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। হিসাবে প্রকাশ পেয়েছে, —এই পাহাড়ের প্রাচীনতা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ কোটি বছর। বয়সকালে এ পাহাড় হিমালয়তুল্য ছিল। তারপর জল আর বাতাসের ঘষায় আস্তে আস্তে ক্ষয়ে গেছে, —সব পর্বতেরই যা' নিয়তি! এখন জেগে আছে তার কঠিনতম শিলাময় অনুচ্চ অন্তস্থল। স্কট্‌ল্যাণ্ডের উচ্চভূমি এই পাহাড়েরই অবশেষ। এর ধারাবাহিকতা আমরা লক্ষ্য করতে পারি নরওয়ে পর্যন্ত। এই গেল উত্তর আটলান্টিকের এক তীর। অন্য তীরে উত্তর আমেরিকায় আবার দেখতে পাই হুবহু একই পাহাড়ের অবশেষ। মহাদেশের সীমারেখার জোড় মিলিয়ে আমাদের কল্পনার অখণ্ড মহাদেশ তৈরী করলে এই পর্বতশ্রেণীও ধারাবাহিক হয়ে ওঠে। মনে হয়, পাহাড়টা আদিকালে অবিচ্ছিন্নই ছিল। খণ্ডটা দেখা দিয়েছে অনেক পরে ; তারপরে সৃষ্টি হয়েছে এখনকার উত্তর আটলান্টিক।

এইরকম নানা ঘটনা থেকেই মহাদেশের সীমারেখার নক্সার জোড় মেলাবার প্রেরণাটা এসেছিল। যেন বহু টুক্‌রোয় ছেঁড়া একটা খবরের কাগজ আমরা সম্পূর্ণ উদ্ধার করছি টুকরোর পাশে টুক্‌রো জোড়া লাগিয়ে। যদি দেখা যায়—ছাপা লাইনগুলোর একটা অর্থ পাওয়া যাচ্ছে—তবেই বুঝতে হবে আমাদের জোড়া লাগানোর কাজটা হয়েছে সঠিক। —উপমাটা জার্মান বিজ্ঞানী আলফ্রেড্‌ ভেগেনারের (Alfred Wegener)। 'চলমান দেশ' তত্ত্বের তিনিই গুরু। ১৯১২ সালেই এই তত্ত্বের কথা তিনি প্রথম বলেছিলেন। বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করেছিলেন

১৯১৫ সালে তাঁর স্মরণীয় 'Origin of Continents and Oceans' বইতে।

এই আলোচনার প্রসঙ্গে হয়তো অনেকেই প্রশ্ন করবেন,—পৃথিবীর বড় বড় দেশ আর মহাদেশগুলোকে সরিয়ে কাছাকাছি আনলে একদম ষোলো আনা খাপ খেয়ে যায় কি? —এর উত্তর হল এইঃ ষোল আনা খাপ খায় না। হিসাবে কিছু গোল থাকে,—যদিও তা, তেমন বেশী কিছু নয়। হিসাবে গোলযোগ হওয়ার প্রধান কারণ দুটোঃ আদি যুগের অখণ্ড মহাদেশ ভেঙ্গে যাবার পরেও ইতস্তত ডাঙা জেগে উঠেছে নানা প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায়; কিংবা ছোটখাট অঞ্চল ডুবে গেছে সমুদ্রের জলে। পৃথিবীর ম্যাপ্ এইভাবে ক্রমাগতই বদলাচ্ছে। এই হ'ল একটা অসুবিধে। দ্বিতীয় কারণ আরও বড়ো। —মহাদেশের 'সীমানা' বলছি কা'কে! 'সীমানা'র এমনিতে কোনো অর্থ নেই। সাগরের জল যেভাবে তা'কে ঘিরে আছে, অর্থাৎ—সাগর-জলের উপরে দেশের যতখানি মাথা তুলে আছে, সেই অনুযায়ী তার সীমানা। অতএব, সমুদ্রের জল যখন বাড়ে বা কমে তখন মহাদেশের সীমানাও পাল্টায়। পৃথিবীর মোট বরফের শতকরা নব্বইভাগের বেশী জমা আছে 'আণ্টার্কটিকা' বা দক্ষিণ মহাদেশে। এই বরফের সবটা যদি গলে, তবে সমুদ্রের জল উঠে যাবে আরও দু'শো ফুট। সামান্য অংশও যদি গলে, তবু সমুদ্রের জল বাড়বে। মহাদেশের উপকূলের কিছু জমি ডুবিয়ে দেবে,—সেইসঙ্গে মহাদেশের ম্যাপ্টাও বদলে দেবে অনেকখানি। বাস্তবেও ঠিক তাই ঘটেছে। ১৯৬৫ সালে বৃটিশ বিজ্ঞানী স্যার এড্ওয়ার্ড (Sir Edward Bullard) কম্পিউটার ব্যবহার করে এই গাণিতিক সিদ্ধান্তে এসেছেন,—সমুদ্রের দু'হাজার মিটার নীচে মহাদেশের যে মানচিত্র হওয়া উচিত, সেই মানচিত্র ব্যবহার করলে মহাদেশগুলো প্রতিবেশী-দের সীমানার সঙ্গে সবচেয়ে খাপ খায়।

ভাসমান এবং চলমান দেশের ধারনা মানুষের মাথায় প্রথম যখন এসেছিল, তারপর অনেক বছর কেটে গেছে; প্রায় পৌনে এক শতাব্দী। ইতিমধ্যে এই তত্ত্বের দায়িত্ব বেড়েছে অনেক। ভাঙা মহাদেশের জোড় মেলানো ছাড়াও আরও অনেক ঘটনার ব্যাখ্যা তা'কে আজ করতে হচ্ছে। প্রকাণ্ড পাহাড়, বিশেষত—আধুনিক যুগের পাহাড়, কেমন ক'রে গ'ড়ে ওঠে। ভূমিকম্প আগ্নেয়গিরির উৎপাত পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ কেন। —আরও রহস্য আছে। সাহারা মরুভূমির ঊষর বুকে জলের দুষ্প্রাপ্যতা সর্বজনবিদিত। বছরে বড় জোর কয়েক ঘণ্টা সেখানে বৃষ্টি হয় বিক্ষিপ্তভাবে। অনেক প্রবীন মরুবাসী সারা জীবনে দেখেনি বৃষ্টিপাতের দৃশ্য। আধুনিক যুগে পাওয়া গেল অদ্ভুত খবরঃ বহু অতীতে

সেখানে ছিল হিমবাহ, —গ্লেসিয়ার। বালির নীচে পাথরের বুকে গ্লেসিয়ার বয়ে যাওয়ার তর্কাতীত সাক্ষ্য ধরা আছে অজস্র লম্বা সমান্তরাল সরলরেখায়। শুধু তাই নয়, শিলার বুকে পরিষ্কার ফুটে আছে জলজ উদ্ভিদের শিলাঙ্ক।—এই সমান্তরাল দাগের সাক্ষ্য যে কোনো গ্লেসিয়ারের—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিজ্ঞানীরা বহু শত মাইল ধরে শূণ্যপথে অনুসরণ করছেন এর আদি প্রবাহপথ। অবশেষে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন,—আজকের সাহারা মরুভূমিতে বহুকাল আগে ছিল দক্ষিণ-মেরু! পৃথিবীতে মেরুদেশের অবস্থান ধ্রুব নয়; তারাও চলমান।—এই রহস্যও আমাদের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যেই পড়ে।

॥ দুই ॥

আগ্নেয়গিরি আর ভূমিকম্পের কারণটা পৃথিবীর পেটেই ভরা আছে, এ কথা বহুকাল আগে থেকেই জানা ছিল। জন্মলাভের পরে 'পৃথিবী' নামে এই অগ্নিপিণ্ডর উপরটাই মাত্র জুড়িয়েছে ; ভিতরটা এখনও কাঁচা,—আনকোরা দশায় ! তাই বমি পেলে পাকস্থলীর আগুন এখনও মাঝে মাঝে বাইরে বেরিয়ে এসে মানুষকে তাড়া করে ; গাছপালা পোড়ায়,—এই রকম ভাসা ভাসা কথা বহুদিন থেকে আমরা শুনে আসছি। ব্যাপারটা রোমাঞ্চকর ! এর সঙ্গে যদি আবার বলা যায়—আস্ত মহাদেশ-গুলোও পৃথিবীর বুকে ভেসে বেড়ায়,—তবে রোমাঞ্চটা ষোলো পেরিয়ে আঠেরো কলায় পৌঁছোয় !

এই রহস্যে আলো ফেলতে হ'লে পৃথিবীকে আরও ভালোভাবে জানা দরকার। পৃথিবীর ওপর এবং ভেতর—দুইই। বস্তুত, 'চলমান দেশ' সম্পর্কে যে আধুনিক তত্ত্বে বিজ্ঞানীরা এসে দাঁড়িয়েছেন, যে তত্ত্ব এখনও পূর্ণতার অপেক্ষায় থাকলেও তার মূল কাঠামোর সত্যতা সম্পর্কে মোটামুটিভাবে তাঁরা নিঃসংশয়, সে তত্ত্বে আসবার জন্যে প্রায় একশো বছর ধরে নিয়মিত পৃথিবী পর্যবেক্ষণের ফলাফল কাজে লাগাতে হয়েছে। পরীক্ষা করতে হয়েছে পাহাড়, আগ্নেয়গিরি ; বিশ্লেষণ করতে হয়েছে ভূমিকম্পের তরঙ্গ ; আর খুব গভীরভাবে জানতে হয়েছে সমুদ্রতলের নানা তথ্য। সমুদ্র নিয়ে দীর্ঘকাল ব্যয়বহুল গবেষণার কিছু কিছু ফলাফল প্রথমেই আমরা আলো-চনা করতে চাই ঃ

(এক) সমুদ্রের তলাটা সমতল নয়। ওর ভিতরে এক প্রকাণ্ড পর্ব্বতশ্রেণী রয়েছে। এত প্রকাণ্ড পর্ব্বত পৃথিবীর উপরে কোথাও নেই। এর দৈর্ঘ চল্লিশ হাজার মাইলেরও বেশী, এবং কোথাও কোথাও সমুদ্রের জল ফুঁড়ে এর কোনো কোনো চূড়া খোলা বাতাসে উঁকি মেরেছে। কিন্তু জলের ভিতরে পাথরের ঘর্ষণ-জনিত ক্ষয় নেই বললেই চলে। কারণ, ঢেউ-এর আন্দোলন কয়েক শো' ফুটের নীচে কখনও পৌঁছোয় না। কিন্তু, বাতাসে মাথা তুললে বাতাস আর জলের ঘর্ষণ নিরন্তর সইতে হবে। উঁচুতে-ওঠা চূড়াগুলো তাই ক্ষয়ে ক্ষয়ে প্রায় সমতল হয়ে গিয়েছে। সেখানে এখন মানুষের বাস। আইস্‌ল্যাণ্ড এর সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ। হাওয়াই দ্বীপও তাই। সেণ্ট্ হেলেনার মতন ছোট দৃষ্টান্ত তো অনেক আছে।

—ওই বিশাল পর্ব্বতশ্রেণীর একটা প্রান্ত আইস্‌ল্যাণ্ডে,—সেখান থেকে আটল্যাণ্টিক মহাসাগরের ঠিক মাঝখান দিয়ে চলে গেছে আমেরিকা আর আফ্রিকাকে দু'ধারে রেখে। তারপর পূর্বে বাঁক নিয়ে ঢুকেছে ভারত মহাসাগরের মধ্যে,—সেখান থেকে প্রশান্ত মহাসাগরে। বলতে গেলে—গোটা পৃথিবীর গায়ে এলোমেলো পেঁচিয়ে রয়েছে। এই পর্ব্বতমালাকে mid-ocean ridge বলা হয়। এখন স্বভাবত প্রশ্ন জাগে—প্রত্যেকটি মহাসাগরের মধ্যে একটা পাহাড় উঠে আছে কেন! অথচ পাহাড়ের দু'পাশের সমুদ্রতল বেশ সমতল।

(দুই) সমুদ্রের জলে লবণের পরিমান দেখে সমুদ্রের বয়েস মোটামুটি বার করা যায়। এই বয়স পৃথিবীর বয়সের সঙ্গে তুলনীয়,—অর্থাৎ, তিনশো কোটি বছরের কম নয়। এই তিনশো কোটি বছরে সমুদ্রে বিরাট পুরু পলির স্তর পড়ার কথা। এই স্তর পরীক্ষা করা হয়েছে আটল্যাণ্টিক, ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের কয়েকটি অংশে। বিভিন্ন কারণে খুবই কষ্টকর এই জাতীয় পরীক্ষা চালানো। সমুদ্রের গভীরতার কারণ এর অন্যতম। যাই হোক, এই পলির স্তরের গভীরতা পরীক্ষা করে অদ্ভুত ফলাফল পাওয়া যায়।—সমুদ্রের নীচে পলির স্তর সর্বত্র সমান গভীর নয়।—প্রথম দৃষ্টিতে এই ঘটনা হয়তো স্বাভাবিকই মনে হবে। কারণ, বড়ো বড়ো নদীগুলো সমুদ্রে যে বিপুল পরিমান পলি ঢেলে চলেছে, তা তো কেবল মোহনা অঞ্চলে, অর্থাৎ—সমুদ্রের তীরবর্ত্তী অঞ্চলে জমে থাকার কথা। সমুদ্রের মধ্যখানে তা যাবে কেমন করে!—কিন্তু, এ ধারণা ঠিক নয়। সমুদ্রের জলের বিরাট আয়তনে উষ্ণতা ও লবণতার আঞ্চলিক তারতম্য থাকেই। সুতরাং, যদিও সমুদ্রের গভীরে স্বাভাবিক অর্থে কোনো তরঙ্গ থাকে না, তবু সেই স্থির জলের গভীরেও সব সময়ে মৃদু পরিচলন-স্রোতের [convection current] ধারা জেগে থাকে। এই স্রোত পলির মিহি কণাগুলোকে বয়ে নিয়ে সমস্ত মহাসাগরের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়। প্রমাণ হিসাবে বলা যায়—সমুদ্রের তীরে যেখানে কোনো বড়ো নদীর মোহনা নেই, সেখানেও পলির স্তর অতি গভীর। সুতরাং, আমরা আশা করতে পারি, সমুদ্রের তলায় সর্বত্রই পলির বেশ পুরু গালিচা পাতা থাকবে। কিন্তু, দেখা গেছে, সমুদ্রের কেন্দ্রস্থলে—যেখানে পর্ব্বতমালার অবস্থান—সেখানে পলির স্তর অতি পাতলা; নেই বললেও চলে। পাহাড়ের দু'পাশে প্রায় পঁচিশ মাইল অবধি এই অবস্থা। তারপর পলির স্তর কিঞ্চিৎ পুরু হয়েছে,—প্রায় একশো দেড়শো ফুট হবে। এই অবস্থা চলেছে তীর অভিমুখে আড়াইশো মাইল পর্যন্ত। তারপর অবশ্য পলির স্তর খুবই গভীর। তীরবর্ত্তী অঞ্চলে তা এক মাইলেরও বেশী গভীর। —এই তথ্য খুবই

বিভ্রান্তিকর। সমুদ্রের মাঝখানটা পরিষ্কার কেন! কে ঝাঁট দেয়! —না কি সমুদ্রের তলায় বয়সের তারতম্য আছে। মধ্য অঞ্চলটা কি তীরবর্তী অঞ্চলের তুলনায় কম বয়েসী?

এই প্রসঙ্গে আরেকটি পরীক্ষার কথাও সংক্ষেপে বলা যায়। —প্রশান্ত মহাসাগরের ভিতরে যে পাহাড় আছে, সেই অঞ্চলের পলির স্তরের নমুনা বিশেষ কায়দায় তুলে আনা হয়েছে। দেখা গিয়েছে—এই নমুনায় সবচেয়ে প্রাচীন যে সামুদ্রিক প্রাণীর ছাপ আছে, তা মিসোজোইক যুগের*। মহাসাগরের মধ্যাঞ্চল থেকে এর চেয়ে পুরোনো প্রাণীর কোনো চিহ্ন মিলছে না। কিন্তু, অন্যান্য সূত্রে আমরা জানতে পারি—সমুদ্রেই পৃথিবীর প্রথম প্রাণী দেখা দেয়, এবং সে ঘটনা মাত্র তেইশ কোটি বছর আগেকার নয়। সমুদ্রে প্রাণী দেখা দেয় প্রায় দু'শো কোটি বছর আগে। উপকূলের কাছে সমুদ্রতলে এইরকম প্রাচীন প্রাণীদের অস্তিত্বের চিহ্ন পাওয়া যায়; কিন্তু, মাঝ-সমুদ্রে নয়। তবে কি সত্যিই বুঝতে হবে—সমুদ্রের তলায় বয়সের আঞ্চলিক ভেদ আছে? সমুদ্রের তলার মধ্য অঞ্চলটা কম বয়েসী?

(তিন) সবচেয়ে গভীর সমুদ্র প্রশান্ত মহাসাগর। এর গভীরতম অংশের নাম 'মারিয়ানা ট্রেঞ্চ্' (Marianas Trench), ফিলিপাইনের কাছে অবস্থান। এখানে মাউন্ট্ এভারেস্ট্ ডুবিয়ে দিলে সে চলে যাবে সাত হাজার ফুট জলের তলায়। কিন্তু, এই গভীরতা রয়েছে উপকূলের কাছে; মধ্য সমুদ্রে নয়। এই রকম ট্রেঞ্চ্ বা গহ্বর প্রশান্ত মহাসাগরে আরও বিস্তর আছে—যেখানে সমুদ্রে হঠাৎ গভীর গর্ত তৈরী হয়ে গিয়েছে। (জাপান ট্রেঞ্চ্, ফিলিপাইন্ ট্রেঞ্চ্, নিউ ব্রিটেন ট্রেঞ্চ্, ওয়েবার ট্রাফ্, জাভা ট্রাফ্ ইত্যাদি।) এদের বৈশিষ্ট্য তিনটি ঃ সরু, গভীর, লম্বা। মজার কথা,—এরা সবাই উপকূলের গা ঘেঁষে রয়েছে; উপকূলপ্রহরীর মতো ঘিরে আছে প্রশান্ত মহাসাগরকে। (তিন নম্বর ছবি)—ব্যাপারটা তবে দাঁড়াল ভারি বিচিত্র! মহাসাগরের মাঝখানে পাহাড়, আর কূলের কাছে গভীর গর্ত! সাধারণ বুদ্ধিতে আমরা তো উল্টোটাই আশা করি। —আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা গিয়েছে। ঐসব ট্রেঞ্চের ঠিক পাশেই যে সব ছোট-খাট টিলাজাতীয় পাহাড় রয়েছে (বড় পাহাড় এ অঞ্চলে থাকবার কথা নয়।), তারা ট্রেঞ্চের দিকে ঝুঁকে আছে; যেন ধীরে ধীরে ট্রেঞ্চের ভিতরেই চলে যেতে চাইছে। —এইসব ট্রেঞ্চের সঙ্গে

---

* Mesozoic Era : (mesos ≡ middle) মোটামুটি সাত থেকে তেইশ কোটি বছর আগের যুগ। এই যুগেই পৃথিবীতে ডাইনোসরের অস্তিত্ব ছিল।

জড়িত আরও দু'টি ঘটনা উল্লেখ করা যায় ঃ

(ক) যেখানেই ঐ রকম ট্রেঞ্চ রয়েছে, সেখানে পৃথিবীর অভিকর্ষীয় আকর্ষণ বল আশাতীত কম। কোনো একটা বল অভিকর্ষের বিরুদ্ধে কাজ করছে। ট্রেঞ্চ্ তৈরী হওয়ার পিছনেও কি রয়েছে ঐ বলেরই অবদান ?
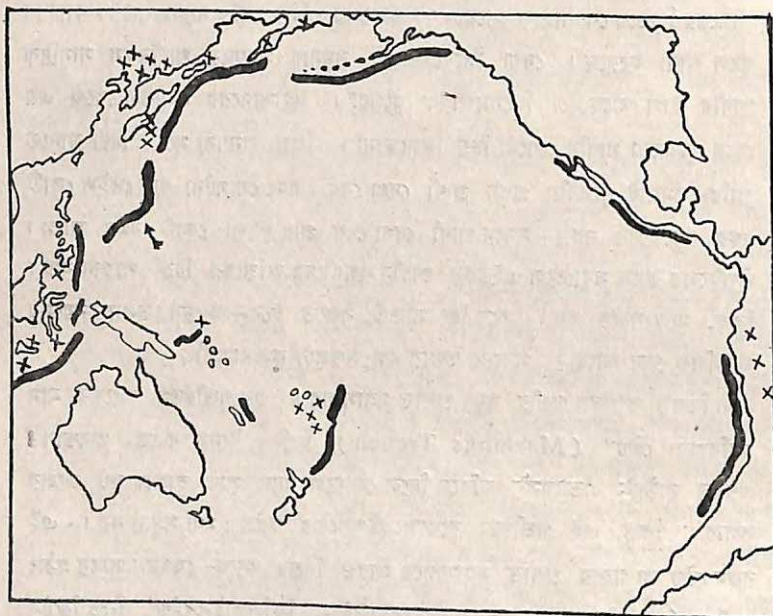
ছবি—৩

প্রশান্ত মহাসাগরের ট্রেঞ্চ্। ট্রেঞ্চ্গুলো উপকূল ঘেঁষে রয়েছে, এবং যেন ঘিরে আছে গোটা মহাসাগরকে। তীর-চিহ্নিত ট্রেঞ্চ্টি বিখ্যাত মারিয়ানা ট্রেঞ্চ্; পৃথিবীর গভীরতম স্থান। ক্রশ-চিহ্নগুলো দিয়ে আগ্নেয়গিরির বিশিষ্ট অঞ্চল বোঝানো হয়েছে। ট্রেঞ্চের নিকট-বর্ত্তী অঞ্চলে আগ্নেয়গিরির অবস্থান লক্ষণীয়। ছোট-খাট অনেকগুলো ট্রেঞ্চ্ ছবিতে দেখানো হয় নি।

(খ) প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল আগ্নেয়গিরির জন্য বিখ্যাত। অদ্ভুত ব্যাপার এই,—ট্রেঞ্চ্গুলোর ঠিক গা ঘেঁষে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে আগ্নেয়গিরির ভিড়। (তিন নং ছবি।) ভূমিকম্পের জন্যও এইসব অঞ্চল বিশিষ্ট।

(চার) পৃথিবীর ভিতর থেকে কি পরিমান তাপ বার হয়ে আসছে, এ নিয়ে পরীক্ষার কথা ভাবা হচ্ছিল তিন শতাব্দী আগে থেকেই। তখনও লক্ষ্য করা হয়েছিল,—খনির যত ভিতরে যাওয়া যায়, তাপমাত্রা ততই বাড়ে। পৃথিবীর ভিতরটা

যে গরম, তাতে সন্দেহ নেই। সেই আদিমকালের আগুন পৃথিবীর পেটে এখনও আছে, বলা বাহুল্য। আধুনিক যুগে জানা গেল আরও কিছুটা অন্যরকম খবর। দু'-তিন শতাব্দী আগে তেজষ্ক্রিয়ার (radio activity) খবর আমাদের জানা ছিল না। এই শতাব্দীতে জানা গেল—পৃথিবীর মাটির নীচে, গ্র্যানাইট্ পাথর-সমৃদ্ধ মহাদেশগুলোর মধ্যে রয়েছে যথেষ্ট তেজষ্ক্রিয় বস্তুর (ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, ইত্যাদি) সঞ্চয়। এ থেকেও তাপ সৃষ্টি হচ্ছে, আর এই তাপও পৃথিবীর ত্বক ফুঁড়ে বার হয়ে আসছে। —পৃথিবীর মাটিতে তাপ পরিবহনের মাত্রা মাপার কাজ অনেক বিজ্ঞানী অনেক জায়গায় ক'রে এসেছেন দীর্ঘকাল ধরে। জানা গেছে—পৃথিবীর মাটির ভিতর এক কিলোমিটার নামলে তাপমাত্রা বাড়ে সতেরো ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্। ···কিন্তু, সমুদ্রের তলায় এই জাতীয় পরীক্ষা ১৯৪৮এর আগে করাই হয় নি। এর কারণ আন্দাজ করা কঠিন নয়। সমুদ্রের নীচে থার্মোমিটার হাতে নিয়ে মানুষ নামবে না। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে কাজ হাসিল করতে হবে। এক হিসাবে অবশ্য সমুদ্রের তলায় এই ধরণের পরীক্ষা করা সহজও বটে। সেখানে গভীর জলের নীচে পৃথিবীর দিন-রাত্রি এবং ষড়ঋতুর প্রভাব নেই। ডাঙ্গায় কাজ করার সময়ে উষ্ণতার দৈনিক এবং ঋতুগত পরিবর্তন নিয়ে প্রচুর মাথা ঘামাতে হয়। যাই হোক ১৯৫০ সালে স্ক্রিপ্‌স্ ইন্‌স্টিটিউসান্ অব্ ওসেনোগ্রাফির আর্থিক বদান্যতায় সমুদ্রের তলায় তাপ পরিবহনের পরীক্ষাটি করা হল। —ফলাফল হ'ল অতি অদ্ভুত।

সমুদ্রের তলা ফুঁড়ে পাথরের নমুনা তুলে আনার কাজ আগেই করা হয়েছিল, এবং সেই সূত্রে জানা গিয়েছিল—মহাদেশে আর মহাসাগরের তলায় একই জাতের পাথর নেই। মহাদেশের ভিতর গ্র্যানাইট্ পাথর, আর মহাসাগরের তলায় ব্যাসাল্টের চত্বর*।

তেজষ্ক্রিয় পদার্থ ব্যাসাল্টে অনেক কম। সুতরাং সমুদ্রের তলায় ব্যাসাল্ট্-স্তরের মধ্য দিয়ে যে তাপ উঠে আসছে, তার পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম হওয়াই উচিত। পরীক্ষায় কিন্তু প্রমাণিত হয়েছে—মহাদেশের ভিতর গ্র্যানাইট্ এবং মহাসাগরের তলায় ব্যাসাল্টের স্তর ভেদ ক'রে মোটামুটি সমান পরিমান তাপ বার হয়ে আসছে।

---

* ব্যাসাল্ট-পাথরের ঘনত্ব গ্র্যানাইটের চেয়ে বেশী। সুতরাং, জন্মের সময়ে পৃথিবী যখন মোটামুটিভাবে তরল ছিল, তখন ব্যাসাল্ট্ পাথর গ্র্যানাইটের তুলনায় গভীর স্তরে নেমে যেতে পারে।

এখানে একটা বিরাট প্রশ্ন দেখা দিল ঃ সমুদ্রের তলায় এই বাড়তি উত্তাপের উৎস কি ! আরও বিস্তৃত পরীক্ষায় জানা যায়,—সমুদ্রের মাঝখানে পার্ব্বত্য অঞ্চলে বেশী তাপ উঠে আসছে ; ট্রেঞ্চের কাছে অনেক কম। —এই বৈষম্যের কারণও খুঁজতে হবে।

(পাঁচ) আমরা জানি, পৃথিবী একটা প্রকাণ্ড চুম্বকের মতন ব্যবহার করে। পৃথিবীর নিজস্ব চৌম্বক বলক্ষেত্র (magnetic field) আছে ; মেরু (poles) আছে। সূতো দিয়ে একটা লম্বা চুম্বককে আনুভূমিক ঝুলিয়ে দিলে তা ঘুরে ফিরে পৃথিবীর চৌম্বক উত্তর-দক্ষিণ মেরু বরাবর এসে স্থির হয়। পৃথিবীর এই চুম্বকত্ব আছে কেন, এটাও পৃথিবী-ঘটিত একটা মূল প্রশ্ন। সম্ভবত, এই গ্রহটির পেটের ভিতরেই এর উত্তর আছে। এই উত্তরের সঙ্গে আমাদের মূল আলোচনার সম্পর্ক থাকাও বিচিত্র নয়।

কিন্তু, এত গভীর অনুসন্ধানে না গিয়েও পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র থেকে আমরা প্রচুর উপকার পেতে পারি ; পেয়েও থাকি। কম্পাস দেখে দিক ঠাওরানো এর অন্যতম। কিন্তু, আরও সূক্ষ্ম ব্যাপার আছে। সেই আলোচনায় এবার আসা যাক। —আগ্নেয়গিরি থেকে যে গলিত পাথর (লাভা) বার হয়ে আসে, তাতে লোহার কিছু ভাগ আছে। অবশ্য, গলিত লাভা এতই গরম যে তাতে লোহার চৌম্বক ধর্ম প্রকাশ পায় না ; কিন্তু, ঠাণ্ডা হয়ে ছ'শো ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডের মধ্যে এলেই তার চৌম্বকগুণ প্রকাশ পেতে থাকে। ফলে, ঐ লাভা যখন ধীরে ধীরে জমে যায়, তখন পৃথিবীর চৌম্বক বলরেখা অভিমুখে তার লৌহ-কণিকাগুলো চুম্বকত্ব লাভ করে। পরবর্ত্তীকালে ঠাণ্ডা লাভা পরীক্ষা করেও জানা যায়—ঐ লাভা সৃষ্টির সময়ে পৃথিবীর চুম্বকের অভিমুখ, অর্থাৎ—চৌম্বক মেরুদুটো কোন্ কোন্ দিক বরাবর ছিল। পরে যদি পৃথিবীর এই উত্তর দক্ষিণ মেরু বদলায়, তা'হলেও কিন্তু ঐ লাভার লৌহ-কণা আর দিক পরিবর্ত্তণ করতে পারবে না। লাভা যখন ঠাণ্ডা হয় তখন তারা লাভার ভিতরে একদম জমে গিয়েছে। সুতরাং, এই দলিল একবার তৈরী হলেই পাকা দলিল। পরে আর বদলানো অসম্ভব। পৃথিবীর আদি কালে অগ্ন্যুৎপাত হত প্রচুর ; লাভাও বার হত অনেক। সে সব লাভা অবশ্য পরবর্ত্তী কালের নতুনতর লাভায় চাপা প'ড়ে আছে অধিকাংশ জায়গায়। কিন্তু এখানেও আরেকটি প্রাকৃতিক নাটক অদ্ভুতভাবে আমাদের সাহায্য করে। —বৃষ্টি আর বাতাসে পাথরের ক্ষয় হয়,—খুব আস্তে আস্তে হলেও। সর্বত্র এই ক্ষয় সমানভাবে হয় না। প্রাকৃতিক অবস্থান ও পরিবেশের উপরে এটা নির্ভর করে,—এ কথা সাধারণ বুদ্ধিতেও

আমরা বুঝি। উদ্দাম ঝড়-বৃষ্টি যেখানে সহজেই আঘাত করে, সেখানে ক্ষয় নিশ্চয় বেশী হবে। যেখানে প্রাকৃতিক আড়াল আছে—সেখানে ক্ষয় হবে কম। ফলে নানা জায়গায় নানা যুগের লাভা-স্তর বার হয়েই আছে। পাথরের বয়স মোটামুটি বার করার পদ্ধতিও আছে। সুতরাং, বিভিন্ন যুগে পৃথিবীর চৌম্বক বলক্ষেত্রর অভিমুখ কি ছিল, তা অনায়াসেই বার করা যাবে। —এই গবেষণায় বিজ্ঞানীরা যা জানতে পেরেছেন, আপাতদৃষ্টিতে তা খুবই অদ্ভুত এবং অবিশ্বাস্য। অতীতে বহুবার পৃথিবীর চৌম্বক-মেরুদুটির স্থান-বিনিময় ঘটেছে। অর্থাৎ—উত্তর মেরু হয়েছে দক্ষিণ মেরু ; দক্ষিণ মেরু হয়েছে উত্তর মেরু। শেষ বার এই বিনিময় ঘটেছে সাত লক্ষ বছর আগে ; এবং সেটাই এখন বহাল আছে। —এই প্রসঙ্গে ব'লে রাখা যায়,—আমরা এখন বোধহয় আরেকটা রূপান্তরের সময়ে পৃথিবীতে রয়েছি। কারণ, পৃথিবীর চৌম্বকবল এখন ক্রমশ দুর্বল হ'তে দেখা যাচ্ছে। এই 'রেট' যদি বজায় থাকে, তবে আর দু'হাজার বছর বাদে পৃথিবীর চুম্বকত্ব লোপ পাবে। তখন আর কম্পাস দেখে দিক ঠাওরানো যাবে না। তারপর পৃথিবীর চুম্বকত্ব হয়তো আবার প্রকাশ পেতে থাকবে ; কিন্তু, মেরু-দুটির জায়গা সম্ভবত বদল হয়ে যাবে। এখন যেটা উত্তর চৌম্বক-মেরু, তখন সেটা হবে দক্ষিণ মেরু। একবার এই বিনিময় ঘটে যাবার পর সেই অবস্থা সাধারণত কয়েক লক্ষ থেকে কয়েক কোটি বছর অবধি স্থায়ী হয়। —এই জাতীয় ঘটনার কারণ এখনও ঠিকমত বোঝা যায় নি।*

উপরের অনুচ্ছেদের আলোচনাটুকু স্থলভাগে সীমিত। সমুদ্রে এই একই গবেষণা আরও যে নিখুঁত ফল দেয়, তাই নয় ; কিছু বাড়তি ফলও দেয়।

---

* এই প্রসঙ্গে দু'একটি অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে নিলে ক্ষতি নেই। স্থলচর ও জলচর নানা প্রাণীর শিলাঙ্ক পরীক্ষা করে একটা চমকপ্রদ ঘটনা লক্ষ্য করা গিয়েছে। যখনই পৃথিবীর চৌম্বক মেরুর স্থান-বিনিময় হয়, তখনই পৃথিবী থেকে প্রচুর প্রাণী চিরকালের জন্য মুছে যায়, এবং অন্যান্য কিছু প্রাণীর আধিপত্য বাড়ে। এই জাতীয় ঘটনার নজির এত বেশী আছে যে একে 'সমাপতন' ব'লে অগ্রাহ্য করবার উপায় নেই। পঁচিশ কোটি বছর আগে যখন পার্মিয়ান যুগ [Permian Period : পূর্বোল্লেখিত মিসোজোইক যুগের ঠিক পূর্ববর্তী সময়।] শেষ হ'তে চলেছে, তখন পৃথিবীতে একবার ঐরকম মেরু বিনিময় ঘটেছিল। দেখা যায়—সে সময়ে পৃথিবী-ব্যাপী প্রকাণ্ড ফার্নের জঙ্গল আর আদি উভচর প্রাণীরা হারিয়ে যায় ; শুরু হয় আধুনিক গাছ-পালা আর সরীসৃপের যুগ। আবার মেরু-বিনিময় হয় মিসোজোইক যুগের শেষ দিকে, যখন ডাইনোসর-যুগের আকস্মিক অবসান হয়। এরপর শুরু হয় স্তন্যপায়ী প্রাণীর যুগ।—এ রকম

সেই কথায় আসা যাক এবার।—জলে-হাওয়ায় লাভা-পাথরের ক্ষয় হয়, আগেই বলেছি। সেই ক্ষয় হওয়া কণিকাগুলো যায় কোথায়? তা'রা বৃষ্টিতে ধুয়ে নানা খাল-বিল দিয়ে নামে ছোট-বড় নদীতে, এবং সবশেষে পলি হিসাবে আশ্রয় পায় সমুদ্রের গভীরে। সেখানে পুরু পলির স্তর পড়তে থাকে। এই কণিকাগুলো যেহেতু লাভা-পাথরেরই কণিকা, তাই এদের ভিতরে লৌহ-কণার সেই চুম্বকত্ব কিন্তু রয়েই গিয়েছে। তবে, নদী-পথে যখন তা'রা ভেসে আসছে, তখন এলোমেলো হয়ে আছে,—পৃথিবীর চৌম্বক বলরেখার অভিমুখে নিজেদের সাজিয়ে নেবার সুযোগ পাচ্ছেনা। সমুদ্রের-তলায় যখন তা'রা থিতিয়ে পড়তে লাগল খুব ধীরে সুস্থে, তখন সেই নিস্তরঙ্গ জলে তা'রা পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণ চৌম্বক মেরু বরাবর আবার নিজেদের সমান্তরাল ক'রে নিল,—কম্পাসের কাঁটা পৃথিবীর বুকে যেমন করে থাকে। সাগরের গভীরে পলির যে স্তর পড়তে লাগল, সেখানেও লৌহ-কণিকাগুলো ঠিক তেমনি সাজানো, আগে যেমন সাজানো ছিল জমাট লাভার ভিতরে। এই পলির স্তর খুব পুরু হয়ে যাবার পরে নীচের দিককার কণিকাগুলো জলের সংযোগ হারায়, এবং নিরন্তর তীব্র চাপের ফলে শেষে পাথরে পরিণত হয়। এই পলি-পাথর (sedimentary rock) পরীক্ষা করেও আমরা জানতে পারি সেই সময়ে চৌম্বক মেরুর অভিমুখ। (কোন স্তরের পলি-পাথর কতটা পুরোনো, তা' ঐ স্তরে কোন্ কোন্ জলজ প্রাণীর শিলাঙ্ক আছে—তাই দেখে বার করা যায়।) বিভিন্ন স্তর পরীক্ষা ক'রে মেরু-স্থানান্তরের পূর্ব-সিদ্ধান্তই পাকা হয়।

(ছয়) কিন্তু, সাগরের পলি-পাথরে আরেকটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যায়, স্থলের জমাট লাভায় যার তুলনা মেলা ভার। —'ফ্র্যাক্‌চার' শব্দটার সঙ্গে বাঙালী পাঠক বিশেষ পরিচিত। হাত-পা ভাঙলেও তো ঐ কথাটাই আমরা ব্যবহার করি। সুতরাং ওর ভূ-বৈজ্ঞানিক বাংলা প্রতিশব্দ আর খুঁজছি না। সমুদ্রের তলার জমিতেও আমরা এক জাতীয় ভাঙন দেখতে পাই; বিজ্ঞানীরা একেও বলেন 'ফ্র্যাক্‌চার'। জিনিসটার চেহারা একটু কল্পনা করবার চেষ্টা করতে হবে। আমরা আগেই

ঘটনা কেন হয় তার সঠিক কারণ বলা শক্ত; তবে সম্ভাব্য কারণ হয়তো নির্দেশ করা যায়। মেরু-বিনিময় হবার সময়ে কয়েক শতাব্দী যাবৎ পৃথিবীর চুম্বকত্ব কার্যত থাকে না। এই সময়ে পৃথিবীতে নানা মহাজাগতিক কণিকার (cosmic ray) উৎপাত বেড়ে যায়। এর ফল হয়তো কোনো কোনো প্রাণীর পক্ষে মারাত্মক হয়ে দাঁড়াতে পারে।

বলেছি—মহাসাগরের মাঝ-বরাবর পাহাড়-শ্রেণী আছে। এই পাহাড়ের মধ্য দিয়ে একটা উপত্যকা লম্বালম্বি চলে গিয়েছে পাহাড় বরাবর। কিন্তু, দেখা যায়, এই পাহাড় কিংবা তা'র উপত্যকা আক্ষরিক অর্থে ঠিক ধারাবাহিক নয়। কয়েক শ' কিংবা কয়েক হাজার কিলোমিটার হয়তো একটানা এগোলো পাহাড়শ্রেণী এবং সেইসঙ্গে তার উপত্যকা,—তারপরেই আচমকা নষ্ট হল তার ধারাবাহিকতা।
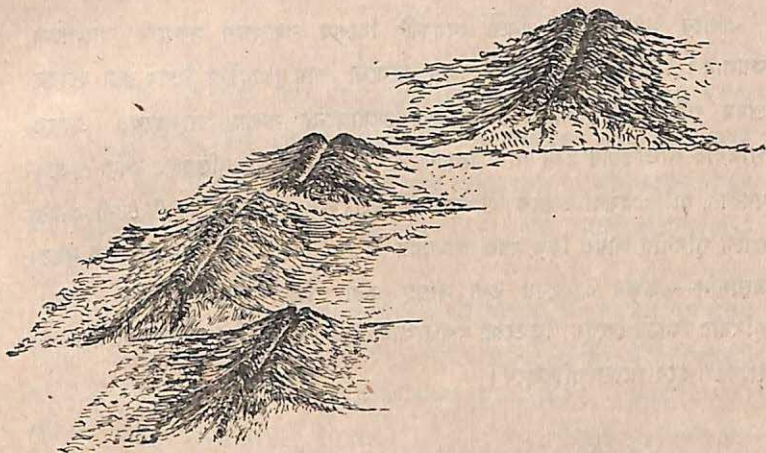
ছবি—৪

মধ্য-সাগরের পর্বতে 'ফ্র্যাক্চার'। এক-এক অঞ্চলের জমি এক-একদিকে স'রে যাওয়ায় পাহাড়ের ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়ে গেছে। (বোঝানোর সুবিধের জন্য পাহাড়ের সরল ছবি আঁকা হয়েছে। বাস্তব ক্ষেত্রে এই পাহাড়ের চেহারা যথেষ্ট এবড়ো-খেবড়ো,—আমাদের পরিচিত পাহাড়ের মতোই)।

কারণ, পর্বতশ্রেণীর পরবর্তী অংশ হঠাৎ এক পাশে সরে গিয়েছে। সমুদ্রের নীচেকার ঐ সুদীর্ঘ পর্বতে এমন আচমকা ভাঙনের বিরতি বহু জায়গায় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ছবি দেখলে (চার নম্বর) ব্যাপারটার ধারণা হয়তো সহজ হবে। বিজ্ঞানীরা ল্যাবরেটরীতে একটা অগভীর পাত্রে মোম ঢালাই করে সাগরতলের কৃত্রিম নমুনা তৈরী করেছেন—মধ্যের পাহাড় ও উপত্যকা সমেত। দেখা গেছে, পাহাড়ের দু'ধারের মোমের জমিতে সমুদ্র-তীরমুখী জোরালো টান পড়লে ঠিক সাগরতলের মতোই 'ফ্র্যাক্চার' হয়। এ থেকে মনে হয়—মধ্য-সমুদ্রের পাহাড়ের দুদি'কের জমিই পাহাড় থেকে দূরে সরে যেতে চাইছে। পাহাড়ের দু'ধারের জমি যদি

সত্যিই পাহাড় থেকে সরে যায়, অথচ বড়ো বড়ো গর্ত্ত ক্রমাগত গজাতে না-থাকে, তবে বুঝতেই হবে—নতুন জমি তৈরী হচ্ছে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে। এবং এখানেই রয়েছে 'চলমান দেশ' তত্ত্বের মূল প্রেরণা।

*　　　*　　　*

এখানে আমরা সমুদ্র নিয়ে কয়েকটি বিশেষ পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করলাম। স্থলভাগে যে সব পর্যবেক্ষণ হয়েছে, তার দু'একটির উল্লেখ করা হয়েছে প্রথম পরিচ্ছেদে। আরও কিছু তথ্য প্রয়োজনের সময়ে বলা হবে। এবারে পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ গঠন আর ক্রিয়াকলাপের এমন একটি যুক্তিসঙ্গত বর্ণনা দেওয়া দরকার, যা' এইসব তথ্যকে উপযুক্ত স্বীকৃতি দেবে। কিন্তু 'থিওরী' তৈরী করার আগে পৃথিবীর আরও কিছু খবর আমাদের অবশ্যই চাই। পাঠকের নিশ্চয়ই নজর এড়ায়নি—এতক্ষণ আমাদের তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছিল পৃথিবীর উপর থেকে। পৃথিবীর কঠিন দেহের ভিতরের খবরে আমরা এখনও যাইনি। এই আলোচনাই সংক্ষেপে হবে পরের পরিচ্ছেদে।

সংশোধন

তিন পৃষ্ঠায়, ১৮ লাইনে, 'ক' হাজার মাইলের 'ক' বাদ যা'বে। হবেঃ হাজার মাইলের উপর—ইত্যাদি।

।। তিন ।।

এই শতাব্দীর চতুর্থ দশক থেকে বিশেষ চেষ্টা শুরু হয় পৃথিবীর ভিতরের অবস্থা জানার। পৃথিবীর কঠিন দেহের ভিতর দিয়ে যে শব্দ-তরঙ্গ যায়, সেই তরঙ্গ বিশ্লেষণ ক'রে পৃথিবীর ভিতরের অনেক খবর জানা সম্ভব। ভূমিকম্পের সময়ে প্রাকৃতিকভাবেই যে তরঙ্গ সৃষ্টি হয়, সেই তরঙ্গ থেকে কার্যত অনেক মূল্যবান খবর বার করা গিয়েছে।

জলে ভাসমান জাহাজে ব'সেও অনেক উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা হয়েছে শব্দ-তরঙ্গ নিয়ে। দু'ভাবে এই পরীক্ষা চালানো সম্ভব ছিল। একটি জাহাজ থেকে জোরালো শব্দ তৈরী করা এবং দূরবর্ত্তী আরেকটি জাহাজে ব'সে সেই শব্দ 'রেকর্ড' করা। দ্বিতীয় জাহাজে শব্দ পৌঁছোবে দু'ভাবে। সোজাসুজিও পৌঁছোবে, আবার জলের ভিতরে গিয়ে প্রতিসরণ হয়ে শিলা ভেদ ক'রে বাঁকা পথে খানিক ঢুকে তারপর উঠে আসবে দ্বিতীয় জাহাজের কাছে। ঐ অঞ্চলে জলের গভীরতা জেনে এবং শব্দ-তরঙ্গ পৌঁছোতে কত সময় লাগল মেপে ঐ শিলাস্তরের ঘনত্ব সম্পর্কে মোটামুটি স্পষ্ট ধারণা হবে। —আবার, মাত্র একটা জাহাজ নিয়েও পরীক্ষা চালানো যায়। শব্দ-তরঙ্গ জলের মধ্যে ঢুকে প্রতিফলিত হয়ে এক সময়ে আবার সোজা উঠে আসবে ঐ জাহাজের কাছেই। —চতুর্থ দশকের পরীক্ষাগুলো প্রায়ই এই দু'জাতের। সাম্প্রতিক কালেও এই পদ্ধতির প্রয়োগ হয়েছে আরও ব্যাপকভাবে। পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রের প্রায় কোনো অঞ্চলই বাদ যায় নি। অবশ্য পদ্ধতি এক হ'লেও এখন অনেক নিখুঁত এবং স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির সাহায্য পাওয়া যায়।

১৯৬১ সালে সমুদ্রের নীচে গভীর গর্ত্ত খুঁড়ে অনেক নীচের বস্তুর নমুনা তুলে আনার এক অভিনব এবং ব্যয়সাধ্য কার্যক্রম নিয়েছিল আমেরিকা। বলা বাহুল্য মানুষ নীচে নামেনি। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র দিয়ে এই কাজ করা হয়েছিল। এই কার্যক্রম 'Mohole Project' নামে বিখ্যাত। কিন্তু, সে যাত্রায় সমুদ্রের নীচের জমিতে দু'শো মিটারের বেশী গভীর গর্ত্ত করা সম্ভব হয়নি ; যদিও নানাভাবে বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল। প্রেসিডেণ্ট কেনেডি এই কার্যক্রমের 'সাফল্য' দেখে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। —সমুদ্রতলে আরও ব্যাপক-

ভাবে গর্ত খোঁড়ার জন্য ১৯৬৪ সালে কয়েকটি মার্কিন সংস্থার বিশিষ্ট প্রতিনিধিদের নিয়ে JOIDES (অর্থাৎ—Joint Oceanographic Institutions for Deep Earth Sampling) নামে একটি সংগঠন জন্ম নেয়, যদিও তার কাজ শুরু হয় কয়েক বছর পরে। উইলিয়াম উয়িং (William Maurice Ewing), রজার রেভিল (Roger Revelle) প্রভৃতি বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা এর ভিতরে ছিলেন। কাজ শুরু হবার কিছুদিন পরে সোভিয়েট্ রাশিয়াও এতে যোগ দেয়। 'Glomar Challenger' নামে একটি জাহাজ বিশেষ ধরণের যন্ত্রপাতি নিয়ে দীর্ঘদিন এই কাজে ব্যস্ত ছিল। বিরক্তিকর অজস্র বাধার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানীদের কাজ করতে হয়। প্রথমত, সমুদ্রের নীচে পাথরের স্তরে গর্ত খুঁড়ে একটা ন'-দশ ইঞ্চি মোটা ক্যাপসুলকে ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া মোটেই সোজা কথা নয়। দ্বিতীয়ত, সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে জাহাজের দোলা এ কাজের প্রধান বাধা। জাহাজের তালে তালে জাহাজ থেকে ঝোলানো যন্ত্রপাতিও নাচতে থাকে, পাথরের গায়ে ইতস্তত ঠোক্কর খেয়ে জখম হয়। তবু দীর্ঘদিনের চেষ্টায় মহাসাগরের নানা জায়গায় গর্ত খুঁড়ে নীচের পদার্থের নমুনা এবং শিলাঙ্ক প্রচুর পরিমাণে উদ্ধার করা হয়েছিল। ১৯৭৩ সালে এই কার্যক্রম শেষ হয়।

মাটির অনেক নীচের পৃথিবীর অবস্থা কেমন, ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা ক'রেও তা' জানবার চেষ্টা হয়েছে। এ কাজ খুবই কঠিন। কয়েক শো' কিলোমিটার নীচে যে প্রচণ্ড চাপ আর তাপ থাকার কথা, পরীক্ষাগারে তা' সৃষ্টি করা সহজ নয়; কিংবা করলেও তা' বেশীক্ষণ রাখা যায় না। তবু, এই পদ্ধতিতে প্রায় হাজার কিলোমিটার নীচেকার পদার্থের অবস্থা কেমন হ'তে পারে—তা' দেখা সম্ভব হয়েছে।

উল্লিখিত সব রকম পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর ভিতরের গঠন সম্পর্কে যা' জানা যায় তা' সংক্ষেপে এইবার বলা যেতে পারে।—পৃথিবীর উপরের আস্তরণ বা 'ত্বক' (crust) যদিও কোথাও খুব বেশী পুরু নয়, কিন্তু এর পুরুত্ব এক-এক জায়গায় এক-এক রকম, এবং উপাদানও স্থানবিশেষে আলাদা। যেখানে মহাদেশগুলো আছে, সেখানে এই ত্বক কুড়ি কিলোমিটারের মত পুরু; কিন্তু যেখানে বিরাট পর্বতমালা ছিল বা আছে—সেখানে এই পুরুত্ব অনেক বেশী। সে তুলনায় বরং সমুদ্রের নীচে যে ত্বক, তা সর্বত্র মোটামুটি একই রকম পুরু,—প্রায় আট কিলোমিটার। ডাঙায় এই ত্বক-বস্তুর গড় ঘনত্ব ২.৬৭; নীচের দিকে অবশ্য আরেকটু বেশী: ২.৭৭। (জলের ঘনত্বকে ১ ধ'রে এই হিসাব করা হয়।) সমুদ্রের ক্ষেত্রে

এই গড় ঘনত্ব কিছুটা বেশী ঃ ২.৯। সমুদ্রের নীচে পৃথিবীর যে আস্তরণ তা'র তিনটি স্তর আছে। সবচেয়ে উপরের স্তরটি পলি-পাথরের,—আগেই যা' বলা হয়েছে। এর নীচে প্রায় এক কিলোমিটার পুরু ব্যাসাল্টের স্তর। সবচেয়ে নীচে চার পাঁচ কিলোমিটার পুরু অতি কঠিন এবং ভারি পাথর। —এই গেল ত্বক-পর্ব।
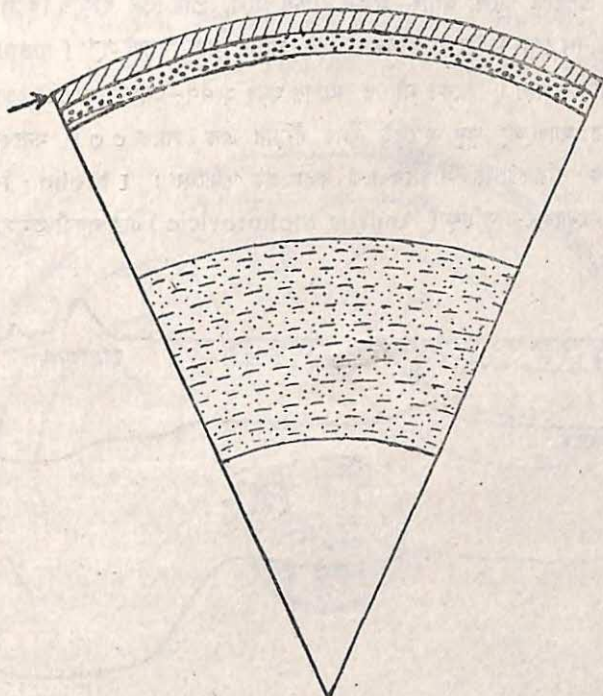
ছবি—৫

পৃথিবীর ভিতরের স্তর-সজ্জা। একেবারে উপরে রেখাঙ্কিত স্তর 'লিথোস্ফিয়ার', অর্থাৎ—ত্বক এবং ম্যাণ্ট্‌ল্‌এর কঠিন বহিঃস্তর। এরই মধ্যে আছে 'মোহো' (তীর চিহ্নিত)। ঠিক নীচে বিন্দু চিহ্নিত অঞ্চল—'নরম' পাথরের অঞ্চল। লিথোস্ফিয়ার এবং এই স্তর একত্রে প্রায় ২৫০ কিলোমিটার পুরু। এর নীচে বিরাট স্তর ম্যাণ্ট্‌ল্‌এর, —প্রায় ২৭০০ কিলোমিটার পুরু। আরও গভীরে 'তরল' কেন্দ্রীয় অঞ্চল—প্রায় ২১০০ কিলোমিটার পুরু। একেবারে কেন্দ্রের কঠিন অঞ্চলের ব্যাসার্দ্ধ প্রায় ১৩০০ কিলোমিটার। (৬নং ছবিও দ্রষ্টব্য।)

এবারে আমরা নজর দিচ্ছি পৃথিবীর একেবারে কেন্দ্রে। বলা বাহুল্য, পৃথিবী যখন প্রায় তরল অবস্থায় ছিল, তখন মাধ্যাকর্ষণের ফলে সবচেয়ে ভারি বস্তু, প্রধানত লোহা

আর নিকেল এই কেন্দ্রেই এসে জমা হয়েছে। এই কেন্দ্রটি প্রায় দেড় হাজার কিলো-মিটার (প্রায় সওয়া ন'শো মাইল) ব্যাসার্দ্ধের একটি গোলোক,—যা'র উপরে বলতে গেলে গোটা পৃথিবীরই ভার-চাপানো। সুতরাং, এই কেন্দ্রের যেমন কাঠিন্য তেমনি ঘনত্ব। ত্বক আর কেন্দ্রীয় অঞ্চলের মধ্যে যে ব্যবধান, তা'র আবার স্থূলত দু'টো ভাগ। উপরের অংশ, অর্থাৎ—ত্বকের নীচের অংশ, প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার (প্রায় উনিশ শো' মাইল) গভীর। এই স্তরের নাম 'ম্যাণ্ট্‌ল্‌' (mantle)। কঠিন পাথরে গড়া। ত্বকের নীচের অংশের ঘনত্ব ২.৭৭—আমরা আগেই জেনেছি। এর পরে ম্যাণ্ট্‌ল্‌ শুরু হ'তেই ঘনত্ব দাঁড়ায় এক লাফে ৩.৩। ঘনত্বের এই আকস্মিক পরিবর্তনের সীমারেখাকে বলা হয় 'মোহো'। [Moho ; বিজ্ঞানী আন্দ্রিয়া মোহোরোভিচিক্ (Andrija Mohorovicic) এর পদবী অনুসারে।]
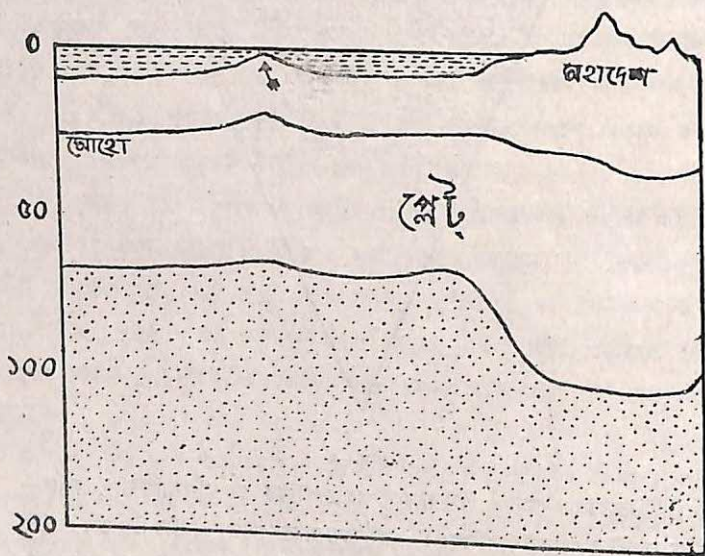
ছবি-৬। পৃথিবীর ভিতরের অবস্থা। উপরের দিকের কয়েকটি স্তর বড়ো ক'রে দেখানো হয়েছে, ৫নং ছবিতে যা সম্ভব হয়নি। গভীরতা প্রকাশ করা হয়েছে কিলোমিটারে। সমুদ্রের জলের ঠিক নীচেই রয়েছে পলি-পাথর এবং ব্যাসাল্টের স্তর। তীর-চিহ্ন দিয়ে মধ্য-সাগরের পাহাড় দেখানো হয়েছে। এর নীচের স্তরটি ম্যাণ্ট্‌ল্‌এর উপাদানে তৈরী। মহাদেশের, বিশেষত পর্বতের, নীচে এই স্তর অতিরিক্ত পুরু। বিন্দু-চিহ্নিত স্তরটি 'নরম' স্তর। (তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।)

ম্যাণ্ট্‌ল্‌এর ঘনত্ব গভীরতার সঙ্গে ক্রমশ বাড়বে ব'লে আশা করা গিয়েছিল ; কিন্তু কার্যত তেমন কিছু দেখা যায় নি। মাঝে মাঝে ঘনত্বের আচমকা বৃদ্ধি হয়েছে বটে, কিন্তু ধারাবাহিকভাবে বাড়েনি। পরমাণু-বিজ্ঞানের সাহায্য নিলে এর কারণ কতকটা বোঝা যায় ; কিন্তু এ আলোচনায় আমরা যাচ্ছি না। একটা অদ্ভুত ব্যাপার কেবল উল্লেখ করে রাখতে চাই।—ম্যাণ্ট্‌ল্‌এর পঞ্চাশ-ষাট কিলো-মিটার নীচে হঠাৎ অল্প ঘনত্বের একটা স্তর শুরু হয়, এবং প্রায় আড়াই শো'
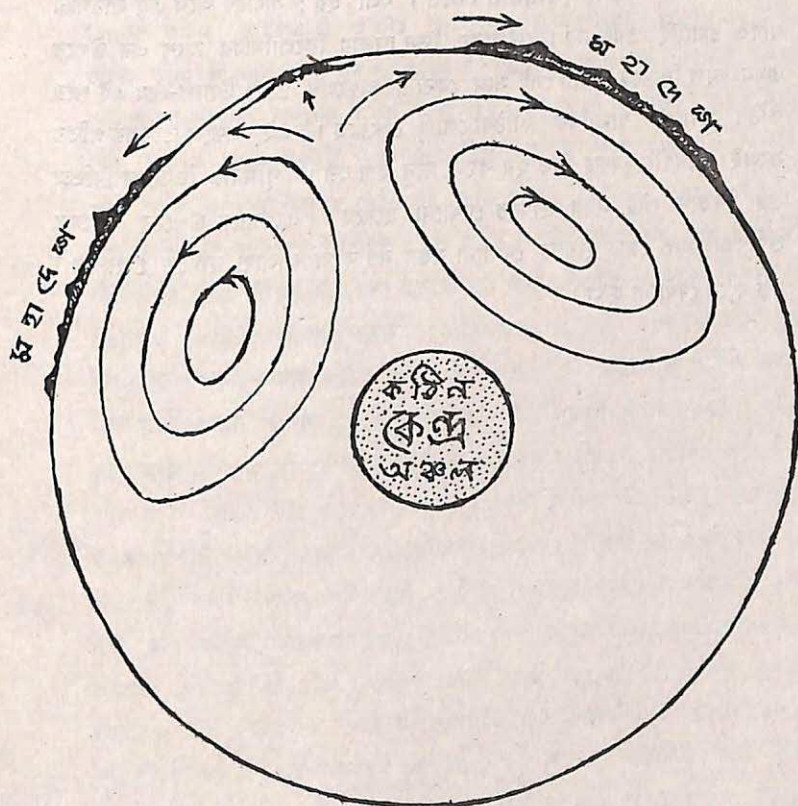
ছবি—৭

মেইনেজের ধারণা। কঠিন কেন্দ্রীয় অঞ্চল গ'ড়ে ওঠার পরে ম্যাণ্ট্‌ল্‌এ অনেকগুলো পরি-চলন-স্রোতের ঘূর্ণি তৈরী হ'ল। (ছবিতে মাত্র দু'টো দেখান হয়েছে।) মহাদেশগুলো এই স্রোতের অভিমুখেই চলমান। উদ্গত লাভার ধাক্কায় মধ্য-সাগরের পর্বতের সৃষ্টি। ঐ পর্বতের অঞ্চল দিয়ে ক্রমাগত নতুন লাভাও ঠেলে উঠেছে।

কিলোমিটার গভীরে গিয়ে শেষ হয়। এখানে একটা 'নরম' স্তর কোত্থেকে এল, তা' আন্দাজ করা খুব কঠিন নয়। উপরের চাপে এবং জোরালো তাপে এখানে পাথর গলতে শুরু করেছে ; সুতরাং, হাল্কা উপাদান ভেসে উঠেছে উপরের দিকে। কিন্তু, আরও উপরে উঠতে পারেনি ; কারণ—ত্বকের কাছাকাছি পৌঁছে পাথর আর গলেনি। বহু পরীক্ষায় এই নরম স্তরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। ম্যাণ্ট্‌ল্‌ এবং কেন্দ্রীয় কঠিন অঞ্চলের মধ্যে প্রায় দু'হাজার কিলোমিটার গভীর অংশটিকে 'কেন্দ্রীয় তরল অঞ্চল' (liquid core) বলা হয় ; সাধারণ অর্থে এই জায়গাটা যদিও মোটেই তরল নয়। উপরের তিন হাজার কিলোমিটার অংশ এর উপরে এমন চাপ দিয়েছে—আর সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় অঞ্চলের প্রচণ্ড উত্তাপ—যে এই স্তরে কঠিন পদার্থের স্বাভাবিক কাঠিন্য লোপ পেয়েছে। এই অঞ্চলে তরলের গতির ফলেই পৃথিবীর চুম্বকত্ব লাভ হয় ব'লে মনে করা হয়। পৃথিবীর ভিতরের বিভিন্ন স্তর বিভাগ পাঁচ নম্বর ছবিতে দেখানো হয়েছে। একেবারে উপরের অংশের স্তরবিভাগ এত ছোট ছবিতে দেখানো সম্ভব নয় ব'লে আলাদা ছবিতে [ছয় নং] বড় ক'রে দেখানো হ'ল।

॥ চার ॥

পৃথিবীর ভিতরে কী ধরণের গতিশীলতার ফলে মহাদেশগুলো 'চলমান' হ'তে পারে, সে সম্পর্কে প্রথম বাস্তব ধারণা দেন ভেনিং মেইনেজ্ (Vening Meinesz) এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে। প্রায় একই সময়ে (১৯২৭-২৯) বিখ্যাত বৃটিশ ভূ-বিজ্ঞানী আর্থার হোম্‌স্-ও (Arthur Holmes) প্রায় একই রকম ধারণার কথা প্রকাশ করেন। কিন্তু, তখন অবধি পৃথিবী সম্পর্কে অনেক জরুরী খবর মানুষের জানা ছিল না। এইসব ধারণা তাই পরবর্তীকালে কিছু 'শোধন' করতে হয়েছে, কিন্তু তা'র মূল কাঠামো বদলাতে হয় নি। —এক পাত্র গরম জলে কী ধরণের পরিচলন স্রোত (convection current) তৈরী হয়, সে বিষয়ে পাঠকের নিশ্চয়ই ধারণা আছে। উপরের স্তরের জল ঠাণ্ডা হয়ে নীচে নামে, আর নীচের গরম জল উপরে উঠে যায়। এইভাবে জলের মধ্যে ঘূর্ণি (eddy current) চলতে থাকে। আদিকালে পৃথিবী যখন সর্বাঙ্গীণ তরল ছিল, তখন কেন্দ্র-অঞ্চলে কঠিন 'শাঁস' তৈরী হয় নি। কাজেই ঐ ঘূর্ণির রকমটা ছিল খুবই সরল,—অর্থাৎ, গোটা পৃথিবীর শরীর জুড়েই ঐ ঘূর্ণি-স্রোত বইত। এটা আর ছবি এঁকে দেখানো হচ্ছে না ; পাঠক অনায়াসে কল্পনা ক'রে নিতে পারবেন। কিন্তু ধীরে ধীরে কেন্দ্রে যখন একটি কঠিন শাঁস তৈরী হয়ে গেল, তখন পৃথিবীর গোটা আয়তন জুড়ে পরিচলন-স্রোতের অস্তিত্ব আর সম্ভব রইল না। ঐ স্রোত তখন বেশ কয়েকটি ছোট ছোট ঘূর্ণি-স্রোতে ভাগ হয়ে গেল। সাত নম্বর ছবি দেখলেই পাঠক ব্যাপারটা বুঝবেন। দু'টি ঊর্দ্ধগামী এবং বিপরীতমুখী স্রোতের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলটার ঊর্দ্ধচাপ নেই। এই জায়গা বরাবর যদি কোনো মহাদেশ থাকে, তবে তা' ভেঙে টুকরো হয়ে যেতে পারে। এখানে ধীরে ধীরে নিম্নভূমি তৈরী হওয়ার একটা প্রবণতা দেখা দেবে। এইভাবে গড়ে উঠবে সমুদ্রের নীচু জায়গা। কিন্তু, ম্যাণ্টল্ এর নীচের দিককার বেশী গরম বস্তু উপরের দিকে উঠছে। সমুদ্রের খাদের মাঝ বরাবর এই ঊর্দ্ধমুখী পদার্থ-স্রোত সম্ভবত একটা পাহাড় তৈরী ক'রে দেবে। বস্তুত, এই পাহাড়ই মহাসাগরের মধ্যবর্ত্তী পাহাড় (mid-ocean ridge)। ম্যাণ্ট্‌ল্‌এর নতুন পদার্থ পৃথিবীর উপরে উঠে আসছে এই পাহাড়ের কোল থেকেই। আধুনিক যুগে সমুদ্রের বহু গভীরে নামাবার

উপযুক্ত যান তৈরী করা হয়েছে। এই জাতীয় যান সমুদ্রের নীচের বহু চমৎকার এবং বিস্ময়কর ফটো তুলে এনেছে। মধ্য-সাগরীয় পর্বতের উপত্যকা দিয়ে কেমন ক'রে ম্যাণ্ট্‌ল্‌এর লাভা আস্তে আস্তে উঠে আসছে, তা ফটো থেকে চমৎকার বোঝা যায়। টুথ্‌-পেস্টের টিউবে চাপ দিলে যেমন বেলনাকারে (cylindrical form-এ) পদার্থ বার হয়ে আসে, ম্যাণ্ট্‌ল্‌এর গভীর থেকে পাথরের আবির্ভাবও ঘটছে ঠিক সেই চেহারায়। নীচের তপ্ততর স্তর থেকে যে পাথর উঠে আসছে, তার সঙ্গে উঠে আসছে যথেষ্ট তাপও। এই জন্যই সাগরতলে, বিশেষত—মধ্য-সাগরীয় পর্বতের উপত্যকায়, আশাতীত বেশী উত্তাপ পাওয়া গিয়েছিল [২য় পরিচ্ছেদ] যা'র কারণ তখন বোঝা যায় নি।

বলা বাহুল্য, পাথরের স্রোত চোখের সামনেই উঠে আসবে জলের মতন কলকল ক'রে—পাঠক নিশ্চয়ই এরকম আশা করেন না। ম্যাণ্ট্‌ল্‌এর ভিতরের এই পরিচলন-স্রোত অতি মন্থর। ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটা আসলে চলে ঠিকই, কিন্তু চোখে তা'র গতি ধরা পড়ে না। ম্যাণ্ট্‌ল্‌এর স্রোত এরই এক চরম ধরণের উপমা। ম্যাণ্ট্‌ল্‌এর নতুন পাথর উপরে উঠে আসার ফলে দু'ধারের পাথরে চাপ পড়ে, এবং এর ফলে ম্যাণ্টলএর উপরের স্তর—সমুদ্রতল সমেত—আস্তে আস্তে চলতে
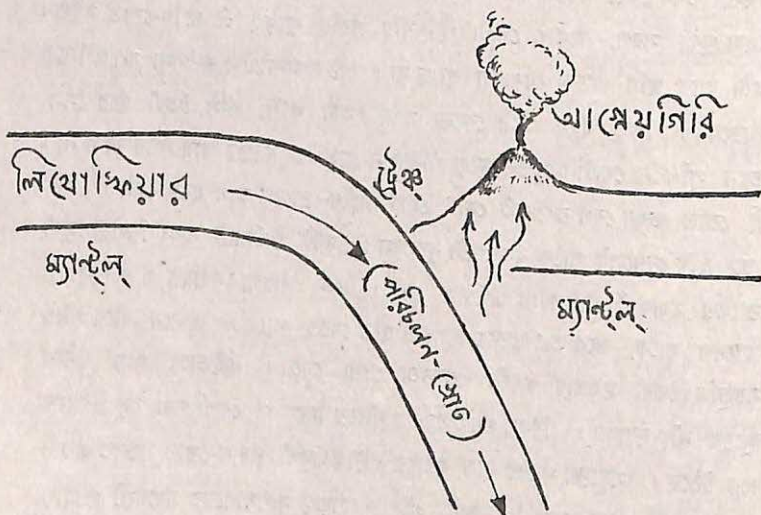
ছবি—৮
মহাসাগরের ট্রেঞ্চ্‌গুলোর উৎপত্তির সঙ্গে বহু আগ্নেয়গিরি এবং ভূমিকম্পের উদ্ভব জড়িত।

শুরু করে ; মধ্য-সমুদ্রের পাহাড় থেকে সমুদ্রতল আস্তে আস্তে দূরে স'রে যায়। সুতরাং, সমুদ্রের তলার মধ্যভাগটা সবসময়েই নতুন গজানো। তীরের দিকে, অর্থাৎ মহাদেশের দিকে, যত এগোনো যাবে—ততই সাগরতলের প্রাচীনত্ব বাড়বে। এ ইঙ্গিত আমরা আগেই একবার দিয়েছি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই—ম্যাণ্টলএর নতুন নতুন পাথর যখন বাইরে উঠে আসছে, তখন পৃথিবীর বাইরেটা নিশ্চয়ই বড়ো হচ্ছে ; অর্থাৎ—পৃথিবী ক্রমশ ফেঁপে উঠছে। —পৃথিবীর বড়ো হয়ে ওঠার এই তত্ত্ব অনেকদিন ধ'রে অনেক স্বনামধন্য বিজ্ঞানীর সমর্থন পেয়েছিল ; এমনকি দশ বছর আগে পর্যন্তও ! আপাতদৃষ্টিতে অবশ্য পৃথিবীর এই ফুলে ওঠার তত্ত্ব বেশ ভালোই লাগে। একটা বেলুনের ফুলে ওঠা কল্পনা করুন। বেলুন যতই ফুলবে তার উপরে দুটি বিন্দু একে অন্যের কাছ থেকে ততই দূরে চলে যাবে। পৃথিবীর মহাদেশগুলোও তেমনি একে অন্যের দূরে সরে যাচ্ছে—এই ছিল যুক্তি। নইলে পৃথিবীর পেট থেকে উঠে আসা নতুন নতুন পাথরগুলো যাবে কোথায় !—কিন্তু, সতর্ক গবেষণায় পৃথিবীর ফুলে ওঠার তত্ত্ব শেষ পর্যন্ত বর্জন করা হয়েছে। অথবা এর ভিতরে সামান্য সত্য যদি থাকেও, তা, এতই কম যে পৃথিবীর একশো কোটি বছরের আয়তন বৃদ্ধিকেও নগণ্য ব'লে মনে করা যেতে পারে। উপরে উঠে আসা নতুন পাথর তা'র পার্শ্ববর্তী স্তরকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দেয়, আমরা আগেই বলেছি। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী ট্রেঞ্চ্ সম্পর্কে আমরা যে আলোচনা করেছি, পাঠক তা, নিশ্চয়ই ভুলে যান নি। ঐ ট্রেঞ্চগুলোর তাৎপর্য তখন আমরা যতটা বুঝেছিলাম, আসলে তার চেয়েও গভীর। সমুদ্রের প্রাচীন শিলাতল মধ্য-সমুদ্র থেকে সরতে সরতে শেষে ঐ ট্রেঞ্চের পথেই আবার পৃথিবীর গভীরে ঢুকে পড়ে। এবং এভাবেই পরিচলন-স্রোতের বৃত্ত পূর্ণ হয়। ট্রেঞ্চএর ঠিক উপরে এই জন্যই মাধ্যাকর্ষণ বল আশাতীত কম। কারণ, ট্রেঞ্চের কিনারা দিয়ে চলছে পদার্থের নিম্নগামী স্রোত। এই নিম্নগামী স্রোতের পথে পাথরের ধ্বস্ নেমে পৃথিবীর ত্বকে যে ভাঙচুর হচ্ছে —তা' থেকে জন্ম নিচ্ছে অধিকাংশ আগ্নেয়গিরি আর ভূমিকম্প। সাত নম্বর ছবি থেকে এটা ঠিকমত বোঝা না-যেতে পারে পারে, তাই আট নম্বর ছবিতে ঘটনাটা বড়ো ক'রে দেখানো হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমরা বলেছি—সাগর তলের শিলাভূমিতে অতীতের পৃথিবীর চৌম্বক মেরু বিনিময়ের সাক্ষ্য আছে। মধ্য-সমুদ্রে যে নতুন পাথর উঠছে, তার লৌহ-কণিকাগুলো তৎকালীন চৌম্বক ক্ষেত্র অভিমুখে চুম্বকত্ব লাভ করবে,—এ কথাও
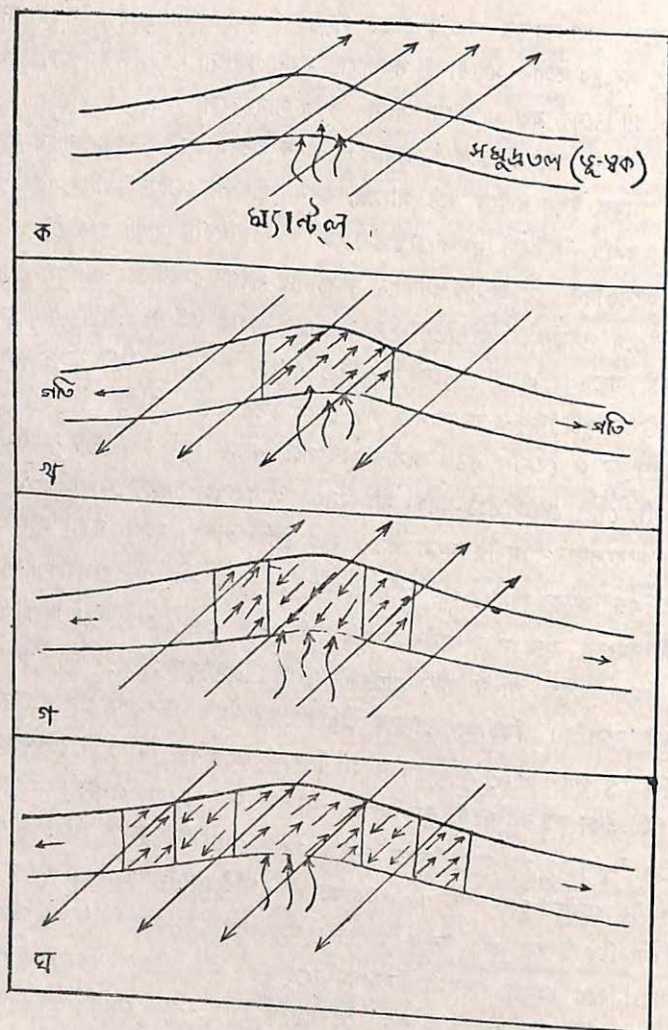
ছবি—৯

মধ্য-সাগরের পর্বত অঞ্চলে ম্যাণ্ট্‌ল্‌এর নতুন পদার্থ ঠেলে উঠছে। উদ্গত লাভায় তৎকালীন চৌম্বক ক্ষেত্রের ছাপ থেকে যাচ্ছে। লাভা জমে যাবার পরে এই ছাপ আর বদলাবে না। (খ) ছবিতে দেখা যাচ্ছে—পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র বিপরীতমুখী হয়ে গিয়েছে। কিন্তু, আগেকার লাভায় তা'র কোনো প্রভাব পড়ে নি। তারপর আরও নতুন লাভা এসে পুরাণো লাভাকে দু' পাশে ঠেলে দিয়েছে [(গ)-ছবি], এবং এইভাবে সমুদ্রতল চলমান। উদ্গত লাভায় সেই সময়কার চৌম্বক ক্ষেত্রর দিক চিহ্নিত হয়ে থাকছে। কিন্তু, ইতিমধ্যে পৃথিবীর চৌম্বক মেরুর বিনিময় হয়েছে আবার। —এইভাবে পর্যায়ক্রমে ঘটনাটি ঘটার ফলে সমুদ্রতলের ভূ-ত্বকে 'জেব্রা'-প্যাটার্ণ তৈরী হ'তে থাকে [(ঘ)-ছবি।]।

আমরা আগে জেনেছি। পরে যদি পৃথিবীর দুই চৌম্বক মেরু স্থান বিনিময় করে, তবে সেই যুগের উদ্‌গত লাভায় (বা পাথরে) সেই যুগেরই চৌম্বক ক্ষেত্রের অভিমুখের প্রভাব থাকবে। এইভাবে সমুদ্রের নীচের শিলায় সমান্তরাল ফিতের মতন কতকগুলো অঞ্চল তৈরী হবে,—একটা 'ফিতে'র বেলায় চৌম্বক ক্ষেত্রের যে দিক চিহ্নিত, পাশের 'ফিতে'য় ঠিক তার বিপরীত। —এই ঘটনাটা চিত্র-পরম্পরায় বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে ন' নম্বর ছবিতে। (এই পরিচ্ছেদের শেষে সংযোজনও দ্রষ্টব্য।)

নানারকম প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সাক্ষ্য (যা' আমরা আগেই মোটামুটি জেনে নিয়েছি) থেকে ম্যান্টলএর ঐ ঘূর্ণি-স্রোতের অস্তিত্ব সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। কিন্তু তা'হলেও এ নিয়ে অনেক প্রশ্ন থাকে। প্রথমত, ঐ স্রোত কি ম্যান্টলএর গোটা গভীরতা জুড়েই চলছে; না কি এটা চলছে কেবল উপরের একটা স্তরে। এটুকু সিদ্ধান্তে আসা গেছে যে—এই স্রোত উপরে উঠে ম্যান্টলএর পূর্বোল্লেখিত 'নরম' পাথরের স্তরের উপর দিয়ে বয়ে যায়। কিন্তু, গভীরে কতটা নামে—সে ব্যাপারে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। দ্বিতীয়ত, মহাসাগরের নীচে এই ঘূর্ণি স্রোতের রকম কতকটা বোঝা গেলেও মহাদেশগুলোর নীচের অবস্থা ঠিক ততটা পরিস্কার নয়। তৃতীয়ত, সমুদ্রের তলাটা নিজেই যখন সঞ্চরণশীল, তখন কি এটাই বুঝতে হবে—সমুদ্রের তলাটা আসলে ম্যান্টলএর উপরের স্তর? অর্থাৎ—সমুদ্রের নীচে পৃথিবীর ত্বক (crust) বলতে সত্যি কিছু নেই? কারণ, আমাদের আলোচনা মানতে হ'লে, চলন-ক্রিয়া তো ম্যান্ট্‌ল্‌এ হবার কথা; ত্বকে কখনই নয়। —এই প্রশ্নগুলোর ভিতরে প্রথম প্রশ্নটাই বোধ হয় সবচেয়ে মৌলিক, এবং আজও নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে।

একেবারে সাম্প্রতিক কালে আমাদের 'চলমান দেশ' এর সমস্যাটিকে একটু অন্যভাবে দেখা হচ্ছে। আলফ্রেড ভেগেনার নিজে ভেবেছিলেন*—মহাদেশগুলো নীচের পাথরের স্তরের উপরে ভেসে আছে—যে পাথরে সমুদ্রতল গড়া। ঐ পাথরের 'সমুদ্রে' মহাদেশগুলো অনেকখানি ডুবে রয়েছে; ভেসে রয়েছে কেবল উপরের তলটা। প্রতিটি মহাদেশ সুতরাং গভীরতর পাথরের উপরে জাহাজের মতন ভাসছে, এবং ধীরে ধীরে চলাফেরা করছে। —কিন্তু, এ কথা মেনে নিতে অসুবিধা এই যে—এক্ষেত্রে জাহাজের চেয়ে জলটাই বেশী ঘন পদার্থ হয়ে দাঁড়াল;

* ভেগেনার প্রদত্ত এই তত্ত্ব নিয়ে এ বইতে আমরা আলাদাভাবে আলোচনা করিনি, যেহেতু এর অনেকাংশ পরবর্তীকালে বর্জিত।

যেহেতু মহাদেশের উপাদান গ্র্যানাইট্ পাথরের চেয়ে তলাকার ব্যাসা্ল্ট পাথরের ঘনত্ব বেশী। অতএব, এ জাহাজ চলতেই পারে না। —ভেগেনারের অবশ্য খুব দোষ ছিল না। যে সময়ে তিনি ঐসব যুগান্তকারী আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন, সেটা প্রথম শ্রেণীর প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব। তখনও তথ্য সংগ্রহের কাজ বস্তুত কিছুই হয় নি। সুতরাং, তিনি কিছু কিছু ভুল করবেন, সেটা বিচিত্র কিছু নয়। পরে হ্যারি হেস্ (Harry Hammond Hess) প্রমুখ বিজ্ঞানীরা পরিচলন-স্রোতের সাহায্যে যেভাবে ঘটনাটি ব্যাখ্যা করলেন—তা' আমরা এইমাত্র আলোচনা করেছি। কিন্তু, এই ব্যাখ্যাটিকে পরে আবার একটু অন্যভাবে দেখা হয়েছে, যদিও এর ফলে আমাদের আগের আলোচনাকে অস্বীকার করা হচ্ছে না।

এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে ভূ-বিজ্ঞানের যে শাখা 'ভাসমান' বা 'চলমান' দেশ নিয়ে আলোচনা করে—তা'র নতুন নাম হয়েছে 'Plate Tectonics'। এই দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষত্ব হ'ল সমস্ত পৃথিবীর উপরের 'তল' (surface) কয়েকটি পুরু খণ্ড বা প্লেট্এ ভাগ করা আছে বলে মনে করা। প্লেট্গুলো পৃথিবীর উপরের তল থেকে আশি বা একশো কিলোমিটার পুরু। এর নাম 'লিথোস্ফিয়ার' (lithosphere), —যা'র ঠিক নীচেই রয়েছে ম্যান্টলএর নরম স্তর। এই প্লেটগুলো তথাকথিত 'নরম' স্তরের উপর দিয়ে অতি ধীর গতিতে সচল,—যা'র কারণ অবশ্যই ম্যান্ট্ল্এর পরিচলন-স্রোত। বড় প্লেটের সংখ্যা গোটা ছয়েক ; ছোট প্লেটও বেশ কয়েকটি আছে। এই প্লেটগুলো সচল হবার ফলে প্রতিটি প্লেট্ তার প্রতিবেশী প্লেটগুলোর সঙ্গে নানাভাবে ক্রিয়া করছে। দু'টি প্লেট্ যদি নিকটবর্ত্তী হবার চেষ্টা করে, অর্থাৎ—সংঘর্ষ হয়, তবে সেখানে 'ভাঁজ' (fold) হয়ে উচ্চতা সৃষ্টি হওয়াই বেশী সম্ভব। দু'টি প্রতিবেশী প্লেট্ যদি দূরবর্ত্তী হতে থাকে, তবে মাঝখানে তৈরী হবে গহ্বর,—সেখান থেকে ম্যান্ট্ল্এর আগ্নেয় শিলা উপরে উঠে এসে আগ্নেয়-গিরি তৈরী করতে পারে। তা'ছাড়া, প্লেটের সীমানায় কিছু ধ্বস্ নামার ফলে ভূমিকম্প হওয়াও খুবই সম্ভব। বস্তুত, পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী ভূমিকম্পর বিন্দু-গুলো যোগ করেই এইসব প্লেটের সীমারেখা আন্দাজ করা হয়েছে। তা'ছাড়া, সমুদ্রতলের যে ফ্র্যাক্চারের কথা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমরা আলোচনা করেছি, সে গুলোও প্রায়শ প্লেটের সীমারেখা নির্দ্দেশক। কোনো কোনো প্লেটের এলাকায় সমুদ্রতলের অংশ এবং মহাদেশের অংশ—দুইই আছে। এরকম কোনো প্লেটের গতি থাকার ফলে মহাদেশের একাংশ বাকী অংশ থেকে আলাদা হয়ে আসতে পারে। একেবারে আলাদা হবার আগে অবশ্য একটা বিরাট ফাটল দেখা দেয়—

যা'কে 'ফল্ট্' (fault) বা 'স্রংস' বলা হয়। ক্যালিফোর্ণিয়ার 'স্যান্ অ্যান্ড্রিয়াস্ ফল্ট্' (San Andrias Fault) খুবই বিখ্যাত। এখানেও দু'টি প্লেটের সংযোগ রেখা রয়েছে, এবং প্লেট দু'টি ক্রমশ পরস্পরের দূরবর্ত্তী হবার ফলে ক্যালিফোর্ণিয়া আস্তে আস্তে আমেরিকা মহাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। এই ফাটল-অঞ্চলে ভবিষ্যতে খুব প্রচণ্ড ভূমিকম্প হবার সম্ভাবনা, যদিও ঠিক ঐ অঞ্চলেই এখনও বহু মানুষ নিশ্চিন্তে ঘর-বাড়ী ক'রে চলেছেন। একটি মদের কোম্পানীর বাড়ীটা এমন জায়গায় পড়েছে যে সেটা আংশিকভাবে দু'টি প্লেটের উপরেই রয়েছে,—যেটা গোড়াতে বোঝা যায় নি। এখন সে বাড়ীর কড়ি-বর্গা আস্তে আস্তে বেঁকে যাচ্ছে ; কোনো কোনো ঘরের ছাদ বসে যাচ্ছে,—বাড়ীর এক অংশ অন্য অংশ থেকে দূরে চ'লে যাচ্ছে। কিন্তু, কোম্পানীর কর্মীরা কেউ এতে ভীত নয়। আসলে এই সব, ভূ-তাত্ত্বিক ক্রিয়া এত ধীর গতিতে হয় যে মানুষ তা'কে সচরাচর আমলই দেয় না। হয়তো ঐ ভূমিকম্পের কেবল সম্ভাবনা নিয়েই কয়েক পুরুষ কাটবে ; কিন্তু চরম মুহূর্ত একদিন আসতে বাধ্য। —সুদূর ভবিষ্যতে ক্যালিফোর্ণিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে একদম আলাদা হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের একটি দ্বীপ হয়ে যাবে, যদিও এটা হ'তে দু'কোটি বছরের বেশী সময় দরকার হবে।......তা'হলে ভেগেনারের মূল ধারণা থেকে আমরা কতখানি সরে এলাম, পাঠক তা' নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন। মহাদেশগুলো তাদের নীচেকার ব্যাসাল্টের সমুদ্রে জাহাজের মত ভাসে না। বরং বরফে আটকে পড়া কাঠের গুঁড়ির মতন তাদের অবস্থা। বরফের খণ্ডটা এগোলে তারাও ঐ সঙ্গে এগোবে। অর্থাৎ—আসলে নড়াচড়া করে প্লেটগুলো। দেশ বা মহাদেশ তাদের উপরে চড়ে বসে আছে মাত্র। —এই প্লেটের সীমারেখা এখনও চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি।

মধ্য-সাগরের পর্বতের কোলে পৃথিবীর গভীর থেকে নতুন লাভা উঠে আসছে, এবং তার ফলে মহাসাগরের শিলাস্তর ঐ পর্বত থেকে দু'পাশেই ক্রমশ সরে যাচ্ছে, —এ কথা আমরা কিছুক্ষণ আগেই বলেছি। কী গতিতে এই ঘটনা ঘটছে সে সম্পর্কে পাঠককে একটা ধারণা দিয়ে এই পরিচ্ছেদ বন্ধ করছি। আটলান্টিক মহাসাগরে [৩০° উত্তর অক্ষাংশ বরাবর] সমুদ্রতলের সরণের গতি বছরে আধ ইঞ্চি [১২ সেণ্টিমিটার]। দক্ষিণ আটলান্টিকে এই পরিমাণ কিছু বেশী। পূর্ব-প্রশান্ত মহাসাগরের তল সরে যাচ্ছে বছরে পাঁচ সেণ্টিমিটার। তিরিশ থেকে চল্লিশ কোটি বছরে এক-একটি মহাসাগরের তলদেশ সম্পূর্ণ নতুন হয়ে যায় ; অর্থাৎ—পুরোণো তলটা ম্যাণ্টেলের গভীরে সম্পূর্ণ ডুবে যায়, এবং উদগত নতুন পদার্থ তার জায়গা নেয়।

সংযোজন :

পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক পরিবর্ত্তন, অথবা—চৌম্বক-মেরু বিনিময়ের কথা আমরা আগেই বলেছি। ম্যাণ্টল্ এর পরিচলন-স্রোতবৃত্ত সমুদ্রতলের গতিসঞ্চার করে, এ সত্য সবচেয়ে ভালো ধরা পড়েছিল তথাকথিত ঐ মেরু-বিনিময়ের ঘটনা-ক্রমেই। এর ইতিহাসটা সুতরাং একটু বিস্তৃতভাবে অনুসরণ করা যেতে পারে; তবে, সময় সংক্ষেপের জন্য পাঠক এই অংশ বাদ দিতেও পারেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে যুদ্ধ-সম্পর্কিত নানারকম বৈজ্ঞানিক গবেষণা খুবই বৃদ্ধি পায়। জলের নীচে লুকিয়ে থাকা 'সাবমেরিণ' বা ডুবোজাহাজের সন্ধান এরোপ্লেন থেকেই নেবার মতন সূক্ষ্ম এক চৌম্বক পদ্ধতি এই সময়ে বা'র হয়। এরোপ্লেন থেকে একটি যন্ত্র দাঁড় দিয়ে ঝুলিয়ে দিতে হ'ত; আর তাতেই ধরা পড়ত জলের অল্প গভীরে লুকিয়ে থাকা ডুবোজাহাজের অস্তিত্ব। পরবর্ত্তীকালে সমুদ্রতলের লাভজনক নানা বৈশিষ্ট্য (যথা :—তেলের খনির সন্ধান মিলতে পারে কি না!) এই পদ্ধ-তিতে আবিষ্কারের চেষ্টা হয়। ভূ-বিজ্ঞানীরা তখন ভাবলেন—স্রেফ্ জ্ঞান-লাভের জন্যও পদ্ধতিটি ব্যবহার করা অনুচিত হবে না। জাহাজ থেকে লম্বা দড়িতে বেঁধে ঐ যন্ত্র জলে ডুবিয়ে দিলেই হবে। দড়িটা লম্বা হওয়াই চাই; নইলে জাহাজের লোহা ইত্যাদি চৌম্বক ধাতুর প্রভাবে পরীক্ষাটি পণ্ড হবে। —১৯৫২ সালে প্রথম এই কৌশল প্রয়োগ করা হ'ল, নিতান্ত কৌতূহল বশতই। কোনো ব্যাপক পরীক্ষা চালানো হ'ল না। উপর উপর কেবল জানা গেল—সমুদ্রতলের চৌম্বক ধর্মের কিছু বিচিত্রতা আছে। ......ব্যাপক পরীক্ষার ব্যবস্থা হ'ল ১৯৫৫ সালে, —যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলে অর্থাৎ—প্রশান্ত মহাসাগরে। ঠিক হ'ল—একটি গবেষণা-যান পূর্ব-পশ্চিম মুখী অনেকগুলো সমান্তরাল পথে বার বার আসা-যাওয়া করবে; এবং একটি পথ থেকে পরবর্ত্তী পথটি হবে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে। —ধৈর্যসাপেক্ষ এই পরীক্ষা যখন শেষ হ'ল, সংগৃহীত ফলাফল পদ্ধতিগতভাবে সাজিয়ে তার চিত্ররূপ দেওয়া হ'ল, এবং সে হ'ল ভূ-বিজ্ঞানের ইতিহাসে অভূতপূর্ব ঘটনা। স্থলভাগের ঘনীভূত লাভায় এবং সমুদ্রতলের পলি-পাথরে চৌম্বক-কণিকাসজ্জার কথা আগেই বলেছি। সমুদ্রতলের চুম্বকত্বের তীব্রতার চিত্ররূপ হ'ল অজস্র সমান্তরাল ফিতের মতন দাগ—উত্তর-দক্ষিণ বরাবর। অবশ্য, একটি অঞ্চল থেকে পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের চুম্বকত্বের তীব্রতার তফাৎ মাত্র শতকরা কয়েক ভাগের; কিন্তু সে পার্থক্যের স্বাক্ষর সন্দেহাতীত ভাবে উদ্ধার করা সম্ভব। ......উৎসাহের বশে পরের বছর ব্যাপকতর অনুসন্ধান চালাবার বন্দোবস্ত হ'ল, —ঐ প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্ত্তী অঞ্চলেই, —মেক্সিকো

থেকে বৃটিশ কলাম্বিয়ার বিরাট বিস্তৃতি জুড়ে। ফল হ'ল ঠিক পূর্ববৎ। তবে দেখা গেল—উত্তর-দক্ষিণমুখী সমান্তরাল শ্রেণীসজ্জা কোনো স্রংস বা ফ্র্যাক্চারে এসে ধারাবাহিকতা হারায় ; যদিও ঐ ফাটলের পরবর্ত্তী জমিতেও অনুরূপ স্বাক্ষর মেলে, —কিন্তু, দেখা যায়, সেখানে দাগের পুরো প্যাটার্ণটাই একদিকে অনেকখানি স'রে গেছে। কতখানি স'রে গেছে, —তা ঐ ফাটলের দু'ধারের দাগ তুলনা ক'রে বোঝা যায়। একটি ফ্র্যাক্চারের দু'ধারের দাগ মিলিয়ে কোনো ধারাবাহিকতা কিছুতেই উদ্ধার করা যাচ্ছিল না। পরে দেখা গেল—সেখানে সমুদ্রতলের একাংশ এক দিকে প্রায় সাতশো মাইল স'রে গেছে।

ঐ সমান্তরাল দাগগুলোর কী ব্যাখ্যা হ'তে পারে, তা নিয়ে প্রচুর আলোচনা শুরু হয় ষাটের দশকের গোড়া থেকে। কিন্তু, প্রথম দিককার কোনো ব্যাখ্যাই তেমন সন্তোষজনক ব'লে গণ্য হয় নি। ১৯৬২ সালে আরেকটি গবেষণা-যান নিয়ে পরীক্ষা চালানো হয় ভারত মহাসাগরে। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড্রামণ্ড্ ম্যাথুস্ (Drummond Mathews) এবং তাঁর তরুণ ছাত্র ফ্রেডেরিক ভাইন্ (Frederick Vine) এই পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করলেন। ভাইন্ সর্বপ্রথম লক্ষ্য করলেন—ভারত মহাসাগরের তলায় একটা উত্তর-দক্ষিণ লাইন বরাবর সাগরতলের পাথরে যে চুম্বক-কণিকাগুলো রয়েছে, —তারা বিপরীতমুখী হয়ে আছে। তার অর্থ, —ঐ পাথর যখন 'তৈরী' হয়েছে, তখন পৃথিবীর চৌম্বক মেরুদুটোর অবস্থান ছিল এখনকার ঠিক উল্টো। এ থেকে আরও একটা ব্যাপার আন্দাজ হ'ল ঃ সমুদ্রতল সবটা একসঙ্গে গ'ড়ে ওঠে নি। তা হলে তো গোটা সমুদ্রতলের পাথরে সব চুম্বক-কণিকাই একমুখী হ'ত। —এর অল্পকাল আগেই হেস্-সাহেব পূর্ব আলোচিত সমুদ্রতল সঞ্চরণের তত্বটি প্রকাশ করেছেন। ভাইন্ এবং ম্যাথুস্ তখন তথাকথিত সমান্তরাল দাগগুলোর ব্যাখ্যা খুঁজে পেলেন। মধ্য-সাগরের পাহাড় অঞ্চলে পৃথিবীর গভীর থেকে নতুন পাথর যখন উঠে আসে, ঐ পাথরের লৌহ-কণিকাগুলো পৃথিবীর তৎকালীন চৌম্বকক্ষেত্রের অভিমুখে সাজানো হয়ে যায়। এইভাবে এক এক যুগের উদগত পাথরে সেই সেই যুগের চৌম্বক বলক্ষেত্রের দিক ধরা থাকে। সুতরাং, সমুদ্রতলের চুম্বকত্ব পরীক্ষা ক'রে যে 'জেব্রা'-প্যাটার্ণ বা তথাকথিত সমান্তরাল সজ্জা লক্ষ্য করা গিয়েছিল, তা বস্তুত পৃথিবীর চৌম্বক-ক্ষেত্রের পর্য্যায়ক্রমিক দিক পরিবর্ত্তণের প্রতিক্রিয়া মাত্র। —এই ব্যাখ্যা একই সময়ে কানাডার দুই বিজ্ঞানীও প্রকাশ করেছিলেন।

১৯৬৫ সালে ম্যাথুস্ এবং ভাইন্ প্রদত্ত ব্যাখ্যার পরীক্ষাগত প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা

হ'ল। হেস্ বললেন—এই ব্যাখ্যা যদি সঠিক হ'য়ে থাকে, তবে বুঝতে হবে, নতুন নতুন উদগত শিলা উঠে এসে পুরোনো শিলাতলকে দূরে ঠেলে দেয় ; আর পুরোণো শিলায় পুরোণো যুগের আর নতুন শিলায় নতুন যুগের চৌম্বক বলক্ষেত্রর দিক আঁকা থাকে। নতুন পাথর যেহেতু ক্রমাগত গজাচ্ছে মধ্য সাগরীয় পর্বতের কোলে (অন্তত হেসের ধারণা তাই), এবং সেই হেতু নবাগত পাথরের চাপে পাহাড়ের দু'ধারেই সমুদ্রতল মোটামুটি সমবেগে সরে যাওয়া উচিত পাহাড় থেকে
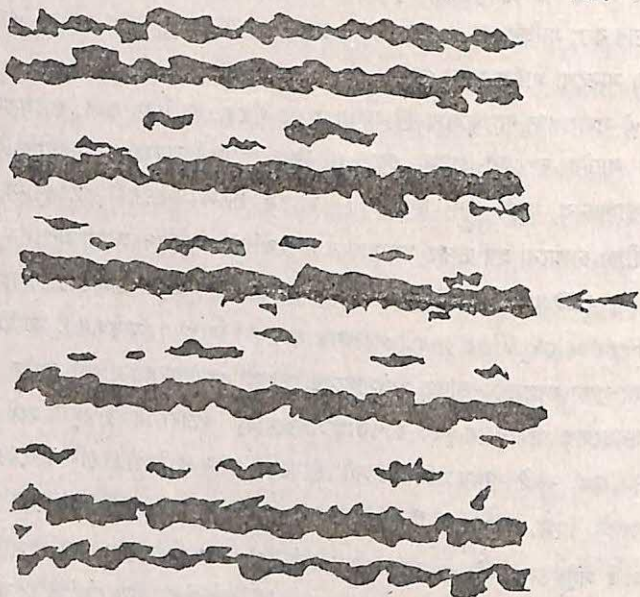
ছবি—১০

তীর-চিহ্ন বরাবর রয়েছে মধ্য-সাগরের পর্বত। এর দু'ধারের ডিজাইনের সাদৃশতা লক্ষ্যণীয়।
(৪র্থ অধ্যায়ে 'সংযোজন' দ্রষ্টব্য।)

ক্রমশ দূরে, অর্থাৎ—সমুদ্র-তটের দিকে, অতএব—চৌম্বক ক্ষেত্রের যে শ্রেণীসজ্জা সাগরতলে ধরা পড়েছে, তা ঐ পাহাড়ের দু'ধারে হবে একই রকম। একদিকের সজ্জা হবে অন্য দিকের প্রতিবিম্বর মতন। সেই সময়কার সংগৃহীত তথ্যের ক্ষেত্রে এই ধারণা প্রয়োগ করে চমৎকার ফল পাওয়া গেল। দশম ছবিতে এই বিষয়টা স্পষ্ট হবে, যদিও এই চিত্রটি কল্পনাপ্রসূত ; সমুদ্রতলের কোনো বিশেষ জায়গার পক্ষে সত্য নয়। ......পরন্তু, কোনো যুগে যদি চৌম্বক বলক্ষেত্র দীর্ঘকাল দিক-পরিবর্তন না-ক'রে থাকে, তবে সমুদ্রতলে একমুখী চৌম্বকবলের ব্যাপ্তি হবে খুব

চওড়া, —কারণ, ঐ দীর্ঘ সময়ে নতুন পাথর উঠে আসার ফলে সমুদ্রতলও অনেকখানি স'রে গেছে। যতখানি স'রে গেছে, ঐ ব্যাণ্ডও হয়েছে ততখানি চওড়া। ঠিক তেমনি, অল্পকালের মধ্যে মেরু-বিনিময় হ'লে পাথরের গায়ে একটি সরু 'ফিতে' তৈরী হবে। সুতরাং, সাগরতলের সঞ্চরণ-গতি জানা থাকলে কবে কবে পৃথিবীর চৌম্বক মেরুর বিনিময় হয়েছে তা জানা যায়। কিংবা এটা জানা থাকলে সমুদ্রতলের চলার গতি বা'র করা যায়।

এই বিষয়টি আর বিস্তৃত করা হচ্ছে না। তবে, এইখানে বলে রাখা যায়, পৃথিবীর চুম্বকত্বের এই দিকটি নিয়ে একটি স্বতন্ত্র বিষয় গ'ড়ে উঠেছে, —যার নাম— paleomagnetism, বা প্রাচীণ-ভূ-চুম্বকবিজ্ঞান।

।। পাঁচ ।।

প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদে 'ভাসমান' বা 'চলমান' দেশ তত্ব গঠনের পটভূমি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি, এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে তত্ত্বটি হাজির করা হয়েছে সরলভাবে। এই আলোচনায় সামগ্রিকভাবে আমরা ঐতিহাসিক ক্রমটি অনুসরণ করি নি আলোচনা বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবার ভয়ে। যাঁরা এই তত্ত্বটি বিকাশের ইতিহাস অনুসরণ করতে চান, তাঁরা বিস্তৃততর অধ্যয়ণের পথে যাবেন। (এই বইয়ের শেষে 'পরবর্ত্তী-পাঠ নির্দ্দেশিকা' দ্রষ্টব্য।) —আমরা এখন এই তত্ত্বের কয়েকটি বাস্তব উদাহরণ নিয়ে কিছু আলোচনা করছি।

সাম্প্রতিক পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো পর্বতমালা হিমালয়ের কথাই প্রথমে ধরা যাক। চলমান দু'টি প্লেটের সংঘর্ষে কী বিরাট ব্যাপার দাঁড়াতে পারে, —এই হিমালয় তারই এক বাস্তব উদাহরণ। সুদূর অতীতে কোনো এক সময়ে পৃথিবীতে দুটি অতিকায় মহাদেশ ছিল ব'লে ধারণা করা যায়ঃ একটি মহাদেশ ছিল দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, অস্ট্রেলিয়া আর আন্টার্কটিকার সমন্বয়, —যার নাম গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড্ (Gondwanaland); এবং অন্যটি উত্তর আমেরিকা এবং ইউরেশিয়ার সমন্বয়, —যার নাম লরেশিয়া (Laurasia)। বিভিন্ন প্লেটের গতির বিভিন্ন দিক এবং মান থাকার ফলে প্রায় কুড়ি কোটি বছর আগে গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড্ থেকে ভারতবর্ষ আলাদা হ'য়ে আসে। বলা বাহুল্য, সেই ভারতবর্ষের মানচিত্র, বিশেষত উত্তরাঞ্চল, আজকের মত ছিল না। আফ্রিকা এবং ভারতবর্ষ যখন উত্তরগামী হ'য়ে এশিয়ার নিকটবর্ত্তী হয়, তখন ইউরেশিয়ার দক্ষিণে এক প্রকাণ্ড সমুদ্র ছিল—যার নাম টেথিস্ (Tethys)*। আফ্রিকা আর ভারতবর্ষ আরও উত্তরে স'রে যাবার ফলে ভূমধ্যসাগরের সঙ্গে ভারত মহাসাগরের সম্পর্ক ছিন্ন হয়, এবং জিব্রাল্টার প্রণালীও সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে আসে। (বিশ্ব মানচিত্র দ্রষ্টব্য।)

---

* গ্রীক পুরাণে টেথিস্ হলেন সমুদ্রের একজন দেবী, —য়ুরেনুস্ (≡ইউরেনাস্) এবং গে-র কন্যা, এবং ওকেয়ানুস্ (≡ওসেনিউস্)-এর স্ত্রী। টেথিস্‌কে পৃথিবীর প্রধান নদীগুলোর মা বলে মনে করা হয়। স্বনামধন্য ভূ-বিজ্ঞানী এডুয়ার্ড সুয়েস্ (Eduard Suess : 1831—1914) আলোচ্য সমুদ্রের এই নামকরণ করেন।

ভূমধ্যসাগরে যে সব নদী এসে পড়ে, তারা এমন কিছু বেশী জল বয়ে আনে না ; বরং তার চেয়ে ঢের বেশী জল ঐ সাগর থেকে বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। ফলে, তখন ভূমধ্যসাগরের প্রায় দু'মাইল গভীর খাত সম্পূর্ণ শুকিয়ে খটখটে হয়ে যায়। অবশ্য পরে প্রাকৃতিকভাবেই জিব্রাল্টার প্রণালী খুলে যেতে ভূমধ্যসাগর আবার জলে ভ'রে ওঠে। (জিব্রাল্টার প্রণালী বন্ধ হ'য়ে গেলে এখনও ভূমধ্য-সাগরের ঐ দশা হবে !) —যাই হোক, ওদিকে ভারতবর্ষ যখন এশিয়ার খুব কাছে এগিয়ে আসে, অর্থাৎ—'ইণ্ডিয়ান প্লেট্' এবং এশিয়ান প্লেট্এ সংঘাতের সূচনা হয়, তখন ঐ সঙ্গমস্থল থেকে টেথিসের জল স'রে যায়, কারণ—উচ্চভূমি জেগে উঠতে থাকে, এবং বহু আগ্নেয়গিরি জন্ম নেয়। এ প্রায় ছ'কোটি বছর আগেকার ঘটনা। এশিয়া এবং ভারতের সংঘাত এত প্রচণ্ড হয় যে ইণ্ডিয়ান্ প্লেটের সামনের অংশ প্রচণ্ড মোচড় খেয়ে নিম্নমুখী হ'য়ে টেথিস্-সাগরের ট্রেঞ্চে ঢুকে পড়ে, এবং এশিয়ান্ প্লেটের সম্মুখভাগ এরই উপরে উঠে আসে। টেথিসের তলদেশের বহুযুগের সঞ্চিত পলি-পাথরের স্তর 'ভাঁজ' (fold) হ'য়ে উপরে উঠতে থাকে ; এবং আজকের এভারেষ্ট্ অঞ্চল এবং তিব্বতের মালভূমি সুদূর অতীতের সমুদ্রতল ছাড়া কিছুই নয়। ১৯২৪ সালে বিজ্ঞানী নোয়েল ওডেল (Noel Odell) এভারেষ্টের পথে ২৭০০০ ফুট ওঠেন, এবং আধুনিক এভারেষ্ট্ যে ভূতপূর্ব সমুদ্রতল—এর স্বপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ তিনিই প্রথম পান। কিন্তু, একটা ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের ধাঁধা লেগে আছে। হিমালয় মূলত যে ধরণের পাথরে তৈরী, তা' সাধারণ পলি-পাথরের চেয়ে অনেক কঠিন। এই কঠিন পাথর এত বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হয়েছিল কীভাবে, তা' নিয়ে এখনও তর্ক আছে। এই তর্কের গভীরে আমরা ঢুকছি না ; অধিকাংশ বিজ্ঞানীর আধুনিকতম ধারণার শুধু সারাংশটুকু তুলে দিচ্ছি। —চতুর্থ পরিচ্ছেদের আলোচনা অনুসরণ ক'রে বলা যায়—ম্যাণ্ট্ল্এর স্রোত যখন সমুদ্রের ট্রেঞ্চের মধ্যে গিয়ে ঢোকে তখন ঐ ব্যাসাল্ট লাভা-স্রোতেরও 'পলি' (sediment) তৈরী হয়, যে পলি-পাথর প্লেটের তুলনায় (অর্থাৎ—ব্যাসাল্টের তুলনায়) হাল্কা। কিন্তু, ট্রেঞ্চের মধ্য দিয়ে এই হাল্কা পাথরের স্রোত সহজে উপরে উঠে আসতে পারে না ; কারণ—নিম্নগামী পরিচলন-স্রোত তা'কে দাবিয়ে রাখে। আপন তেজস্ক্রিয় উপাদানের প্রভাবে ঐ হাল্কা পলি গ'লে গ্র্যানাইটের রূপ নেয়। মোটামুটিভাবে আন্দাজ করা যায়, —আজ থেকে এক কোটি বছর আগে ঐ পরিচলন-স্রোত (কিংবা, আধুনিকতর ভাষায়, প্লেটের গতি) কোনো কারণে সাময়িকভাবে মৃদু হয়ে গিয়েছিল। ট্রেঞ্চের

নীচে আটকে থাকা হাল্কা-পাথর গ্র্যানাইটের বিরাট সঞ্চয় তখন ঐ টেথিসের ট্রেঞ্চ্ দিয়ে প্রচণ্ডভাবে উপরে উঠে আসে, এবং হিমালয়কে ঠেলে অনেক উঁচুতে তুলে দেয়। বলা বাহুল্য, সবার উপরে (অর্থাৎ—এভারেস্ট্ অঞ্চলে) থেকে যায়, টেথিস্এর পলি-পাথর। জানা যায়, হিমালয় দীর্ঘকাল যাবৎ বেশ নীচু পর্বতই ছিল। এর বিশেষ উত্থান হয়েছে গত ছ'লক্ষ বছরের ভিতরে। এভারেস্ট্ এখনও উঁচু হচ্ছে,—সম্ভবত বছরে আধ ইঞ্চি ক'রে। ভারত এবং এশিয়ার স্পর্শ নিবিড়তর হয়ে চলেছে। —ঠিক হিমালয়ের মতোই জন্ম-কাহিনী আল্পস্ পর্বতের। অনেকে মনে করেন —এশিয়া আর ইউরোপের সন্ধি-স্থলে উরাল পর্বতও এশিয়া আর ইউরোপের দু'ই স্বতন্ত্র প্লেটের সংঘাতের ফল, যদিও এর সত্যতা সম্পর্কে এখনও নিশ্চিত হওয়া যায় নি।......বস্তুত 'চলমান দেশ' তত্ত্বের সঙ্গে পর্বতের জন্মের সম্পর্কটা ভূ-বিজ্ঞানীরা মোটামুটি ধরতে পারলেও অনেক কিছু খুঁটিনাটি ব্যাপার এখনও ঠিক বোঝা যায় নি। মোটামুটিভাবে পর্বতকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। দু'টি প্লেট যখন পরস্পরের কাছে এগিয়ে আসে একই রেখা বরাবর, তখন পাথরে 'ভাঁজ' প'ড়ে তৈরী হয় 'ভাঁজ-পড়া পর্বত' (fold mountain)। একেবারে নিখুঁত তরঙ্গায়ত ভাঁজ চোখে দেখার সম্ভাবনা অবশ্য কম; কারণ—পর্বতটি গ'ড়ে উঠতে উঠতেই অনেক ভাঙ্গচুর হয় এবং ক্ষয় হয়। হিমালয়, আল্পস্, আণ্ডিজ ইত্যাদি এই জাতীয় পাহাড়ের দৃষ্টান্ত। দু'টি প্লেট্ বিভিন্নমুখী হয়েও সংঘাত হ'তে পারে; যা'র ফলে পৃথিবীর ত্বক সোজাসুজি ভেঙে গিয়ে উপরে ঠেলে ওঠে বিরাট বিরাট খণ্ডের আকারে। এই জাতীয় পর্বতকে 'block mountain' বলা হয়। ক্যালিফোর্ণিয়ায় এই জাতীয় পাহাড়ের নমুনা আছে। আবার অনেক সময়ে পৃথিবীর ত্বকে ভাঁজ পড়ার ঘটনাটি এমন ধীর ও মৃদুভাবে ঘটে যে পৃথিবীর ত্বক একটি প্রায়-মসৃণ ফোঁড়ার মতন ফুলে ওঠে। জল-বাতাসের দীর্ঘকালীন স্পর্শে এর মসৃণতা আরও বেড়ে যায়। গম্বুজ-সদৃশ এই পাহাড়কে 'dome mountain' বলা চলে। বৃটেন এবং অস্ট্রেলিয়ায় এই জাতীয় পাহাড়ের নমুনা আছে। কিন্তু এই পাহাড় খুব বড় হ'তে দেখা যায় না।......পৃথিবীর আরেক আশ্চর্য কলোর‍্যাডো নদীর গিরিখাত (grand canyon)। প্রতি বছর বহু লক্ষ দর্শক ঐ রোমাঞ্চকর দৃশ্য দেখতে আসেন। অনেকেই ভাবেন—নদীটা বোধহয় খুব পুরোনো, কিংবা এখানকার পাথর খুব নরম; তাই নদীটা পাথর কেটে নেমে গেছে এক মাইলের ও বেশী নীচে। —নদী অবশ্য পুরোনো ঠিকই, —কিন্তু, সেই কারণেই পাথরের জমিকে সে অমনভাবে কাটতে পেরেছে—তা' নয়। আসলে

নদীটা তেমন নীচে নামেনি। বরং দু'ধারের পাথরের স্তর উপরে উঠে গিয়েছে। অনেক দর্শক বোঝেন না যে তাঁরা একটা পাহাড়ের ক্ষয়িত চূড়ায় দাঁড়িয়ে নীচের নদী দেখছেন। কলোর‍্যাডোর গিরিখাতের ব্যাপারটাও পাহাড় গ'ড়ে ওঠার তত্ত্ব দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায়; কিন্তু এক্ষেত্রে অনেক জটিল ঘটনাক্রম জড়িয়ে রয়েছে। অতীতে এই অঞ্চল সমুদ্র গ্রাস করেছিল দু'বার, এবং সমুদ্র ভেদ ক'রে পাহাড় সৃষ্টিও হয়েছিল দু'বার। গিরিখাতের পাথরের স্তর পরীক্ষা ক'রে বিজ্ঞানীরা পুরো ইতিহাসটা ছবির মতন সাজাতে পেরেছেন। কিন্তু এর বিস্তৃত ইতিহাসে আমরা যাচ্ছি না।

তথাকথিত প্লেটএর নানা বিচিত্র গতি এবং বিচিত্রতর সংঘাতের ফলে পৃথিবীর নানা দেশে হরেক রকম পরিবর্তন হয়ে চলেছে। উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূল উঁচুতে উঠছে, দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল নামছে; হল্যাণ্ড প্রতি শতাব্দীতে এক ইঞ্চি ক'রে ডুবে যাচ্ছে; উত্তর বাল্টিক সমুদ্র বরাবর ফিনল্যাণ্ডের তীরভূমি শতাব্দীতে এক মিটার ক'রে উঠছে; উত্তর আমেরিকার সুপীরিয়র হ্রদের (Lake Superior) উত্তর তীর শতাব্দীতে দু'মিটার পরিমান মাথা তুলছে। অবশ্য, এর সবগুলোর কারণই যে প্লেটের চলাফেরা, তা' নয়। শেষ 'হিমবাহ'র* বিপুল

---

* অতীতের পৃথিবী বহুবার আকস্মিকভাবে শীতল এবং ব্যাপকভাবে তুষারাবৃত (glaciated) হয়ে পড়েছে। জানা যায়, পৃথিবীতে সূর্যের যে তাপ আসে, তার পরিমান সময়ের সঙ্গে বাড়ে-কমে। সেই অনুসারে পৃথিবীতে মাঝে মাঝে এক-একটা তুষার যুগের (ice-age এর) সূচনা হয়। ব্যাপকভাবে তুষারের অবস্থান-কালকে তুষার-যুগ বলা হয়। দুই তুষার যুগের মধ্যবর্তী যুগকে তুষার-অন্তবর্তী যুগ (interglacial period) বলা চলে। এই সময়ে পৃথিবীর মোট তুষারের পরিমান যথেষ্ট হ্রাস পায়। তুষার-যুগ হবার কারণ সম্পর্কে মতভেদ প্রবল। এমন হ'তে পারে, —আদি কালে কোনো কোনো সময়ে আগ্নেয়গিরির উৎক্ষিপ্ত ভস্ম, উল্কা-বৃষ্টিতে সূক্ষ্ম কণিকা, ধূলিকণা এবং ঘন মেঘের প্রাচুর্যে সূর্য-কিরণ হয়তো বিশেষভাবে বাধা পেয়েছে, এবং দীর্ঘস্থায়ী ব্ল্যাক আউটের ফলে পৃথিবী অত্যন্ত শীতল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু, বারবার এই ঘটনাই ঘটছে কি না, তা' বলা শক্ত। এ বিষয়ে আরও নানা মত রয়েছে। সবশেষ হিমবাহ দেখা গিয়েছিল ২৫০০০ বছর আগে, এবং পরবর্তী কয়েক হাজার বছরে পৃথিবীতে বরফের পরিমান বেড়েই চলে। জার্মানী এবং ইংল্যাণ্ডের উত্তরাঞ্চল প্রচুর বরফে ঢাকা পড়ে। উত্তর আমেরিকার অধিকাংশ অঞ্চল প্রায় এক মাইল পুরু বরফের নীচে চ'লে যায়। এই বরফ গলতে শুরু করলে সমুদ্রের জল প্রায় ৪০০ ফুট বেড়ে ওঠে। নানা জায়গায়, বিশেষত—কুমেরু অঞ্চলে বরফের বিধ্বস্ত গভীর গর্ত খুঁড়ে এবং নানা যুগের বরফ পরীক্ষা করে অতীতের বিভিন্ন তুষারযুগ সম্পর্কে অনেক চিত্তাকর্ষক তথ্য পাওয়া গিয়েছে।

পরিমাণ বরফ অনেক দিন ধরে অনেক দেশের উপরে চেপে বসে ছিল ; সেই বরফ গ'লে যেতে অনেক দেশের ঘাড় থেকে বোঝা নেমে গিয়েছে। তা'রা এখন হাল্কা হয়ে একটু উপরের দিকে উঠছে। হিম-যুগের সঙ্গে চলমান-দেশ তত্ত্বের একটা সম্পর্ক আছে,—সেটা এইখানে সংক্ষেপে ব'লে রাখা যায়। পৃথিবীতে মহাদেশগুলো যেহেতু চলমান, তাই কোনো সময়ে মেরু অঞ্চলে কোনো মহাদেশ থাকতেও পারে, না-ও থাকতে পারে। যখন মেরু-অঞ্চলে কোনো মহাদেশ থাকে, তখন স্বভাবতই সে তুষারাবৃত হয়ে থাকে, এবং তা'র ফলে সূর্য থেকে যে রশ্মি ঐ মহাদেশে এসে পড়ে, তা' মূলত বরফের উপর থেকে প্রতিফলিত হয়ে যায়। এইভাবে পৃথিবী সূর্যের অনেকখানি উত্তাপ নিতে ব্যর্থ হয়। যদি ওখানে কোনো মহাদেশ না-থাকে, তবে সূর্য-রশ্মি সমুদ্রের জলকে কিছুটা উত্তপ্ত করবে, এবং উত্তাপ জলের পরিচলন-স্রোতে পৃথিবীর সব সমুদ্রে ছড়িয়ে যাবে। সুতরাং, মেরু-অঞ্চলে কোনো মহাদেশ এসে পড়লে পৃথিবী আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়, এবং একটা হিম-বাহ দেখা দিতে পারে বলেও মনে করা হয়। তবে, এই মতের স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। বিজ্ঞানীরা কিন্তু মনে করেন—দক্ষিণ-মেরু অঞ্চল থেকে আণ্টার্ক্‌টিকা স'রে যাবার পরে পৃথিবী কিছুটা উষ্ণ হবে, এবং তখন আরও অনেক বরফ গলে যাবে। তবে, আণ্টার্কটিকা সরে যেতে এখনও বহু কোটি বছর দেরী আছে।

'চলমান দেশ' তত্ব (আধুনিকতর ভাষায় plate tectonics) যেমন পর্বতের অভ্যুত্থান নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে, তেমন মাথা ঘামিয়েছে সমুদ্রের বিবর্তন নিয়েও। কিন্তু, পর্বতের ক্ষেত্রে সে যতটা সফল সমুদ্রের ক্ষেত্রে ততোটা নয়। আপাতদৃষ্টিতে হয়তো মনে হবে—'সমুদ্র' আবার 'সৃষ্টি' হবে কি ! নীচু জায়গায় ক্রমাগত বৃষ্টির জল জমতে জমতেই তো সমুদ্র !—কিন্তু, বস্তুত তা' নয়। অত সহজে সমুদ্র তৈরী হয়নি। তা'ছাড়া, সমুদ্রের জলের উৎস নিয়েও নানা জটিল তর্ক আছে। একটা বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত হয়েছেন যে—সমুদ্রের এই বিরাট গভীরতা এবং উদ্দামতা নেহাৎই আধুনিক যুগের ঘটনা ; কয়েক কোটি বছরের বেশী নয়। কিন্তু, তারও অনেক আগে থেকে পৃথিবীতে সমুদ্র ছিল,—যদিও তা'তে বেশী জল ছিল না ; স্রোতও ছিল কম। অত দীর্ঘকাল সমুদ্র অগভীর থেকে এত অল্প সময়ের মধ্যে এত জল কোথায় পেলো—এই প্রশ্নের জবাব বেশ কিছুকাল ধরেই খোঁজা হচ্ছে। এটা এখন ভূ-বিজ্ঞানীদের কাছে একটা মূল সমস্যা।

।। ছয় ।।

যে তত্ত্বের সঙ্গে এতক্ষণ আমরা পরিচিত হচ্ছিলাম, তার বাস্তব সুবিধার কোনো দিক আছে কিনা, সেটা আমাদের সর্বশেষ বিবেচনার বিষয়। এ সম্পর্কে প্রথমেই সত্যি কথা ব'লে রাখা যায় যে—এই 'চলমান দেশ' তত্ত্ব মানুষের জীবনে উপকারে লাগবার মত অবস্থায় ঠিক এখনই বোধ হয় এসে পৌঁছোয়নি। কিন্তু, অদূর ভবিষ্যতেই যে অন্তত খানিকটা পৌঁছোবে, সে সম্ভাবনা এখনই দেখা যায়। এ ব্যাপারে দু'টো সম্ভাবনার কথা আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি।

প্রথমত, খনিজ (mineral) এবং আকরিক (ore) প্রসঙ্গে। পৃথিবীর কোথায় কোথায় কী ধরণের আকরিক বেশী পরিমাণে থাকার সম্ভাবনা, এ বিষয়ে যদি ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়, তবে একটা বড় কাজ হবে সন্দেহ নেই। আকরিক দু'শ্রেণীর হয়,—প্রাথমিক (primary) এবং গৌণ (secondary)। প্রথম জাতের অন্যতম সদস্য তামা, সীসা, দস্তা, রূপা ইত্যাদি। বিভিন্ন জটিল ভূ-তাত্ত্বিক ক্রিয়ায় এরা পৃথিবীর গভীরতর অংশ থেকে ভূ ত্বকে এসে হাজির হয়। একেবারে উপরের তলায় পাথরের আবরণ ক্ষয়ে গিয়ে এইসব আকরিক শেষ পর্যন্ত মানুষের দৃষ্টির সীমায় এসে পড়ে। এই প্রাথমিক আকরিকের সঞ্চয় মূলত প্লেটের চলা-ফেরার ব্যাকরণে নিয়ন্ত্রিত। বলা বাহুল্য, উল্লেখিত আকরিকের সৃষ্টির জন্য ভূ-ত্বকের পাথরে উচ্চ তাপ প্রয়োগ প্রয়োজন। দুভাবে এই তাপের প্রয়োগ হতে পারে। প্রথমত, ম্যাণ্ট্‌ল্‌এর পরিচলন স্রোত যেখানে সোজাসুজি উঠে এসে ভূ-ত্বককে স্পর্শ করছে। এখানে উত্তাপের অভাব নেই, কারণ, পৃথিবীর গভীর থেকে উঠে আসা পাথরের সঙ্গে যথেষ্ট তাপ উঠে আসছে। দ্বিতীয়ত, ট্রেঞ্চের গভীরে। নিম্নগামী পাথরের স্তরের এক লঘু অংশ 'পলি' হিসাবে ঠেলে উঠতে চায় উপরের দিকে ; কিন্তু, নিম্নগামী স্রোতে বাধা পায়। এই বদ্ধ পাথরের সঞ্চয় নিজেরই তেজস্ক্রিয় উপাদানের প্রকটে প্রচণ্ড তপ্ত হতে থাকে, —পঞ্চম পরিচ্ছেদে আমরা যা' আলোচনা করেছিলাম তা পরে কোনো সময়ে এই ঊর্দ্ধমুখী পাথরের স্রোত হয়তো সত্যিই উঠে যেতে পারে ত্বকের কাছে। কিন্তু, ইতিমধ্যে প্রচুর উত্তাপ পাওয়ার ফলে এই পাথরে প্রাথমিক

আকরিক থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা। —সুতরাং, বোঝা যাচ্ছে, পৃথিবীর ভিতরের পরিচলন-স্রোতবৃত্তগুলোর সঠিক গতিপথ বা অবস্থান জানা থাকলে কোথায় কোথায় প্রাথমিক আকরিক পাবার সম্ভাবনা বেশী—তা-ও আমরা জেনে ফেলতে পারি। এই ধরণের তথ্য সংগ্রহে এখন পর্যন্ত কোনো উচ্চ সাফল্যের নজীর অবশ্য রাখা যায় নি। পৃথিবীকে আরও সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করলে এবং নানা ভূ-তাত্ত্বিক ঘটনা আরও ভালোভাবে বিশ্লেষণ করলে এ ব্যাপারে কিছুটা সাফল্য আসবে ব'লে মনে হয়। প্রাথমিক আকরিক বাদে আর রইল গৌণ আকরিক। খনিজ তেল যার অন্যতম উদাহরণ। এই জাতীয় আকরিকের সৃষ্টি বা সঞ্চয় মূলত নির্ভর করে দেশ বা মহাদেশের চলাফেরার উপরে। বর্তমানের কোন অঞ্চল অতীতে কোন সময়ে কোথায় ছিল—এই তথ্য এই প্রসঙ্গে বিশেষ জরুরী ; কারণ—কোন দেশের আব-হাওয়া অতীতে কেমন ছিল—তার সঙ্গেই এই বিষয়টা জড়িত। পূর্ব আফ্রিকায় কেন খনিজ তেল নেই, এবং উত্তর আলাস্কায় কেন আছে, —এই ভাবেই তার ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি আরও গুরুতর। আমরা আগেই বলেছি—চলমান প্লেটের সঙ্গে ভূমিকম্পের সম্পর্ক কতো নিকট। এবং আমরা জানতে পেরেছি, —বিভিন্ন প্লেটের সাধারণ সীমানার অঞ্চল ভূমিকম্পের জন্য বিশিষ্ট। এখন, আমাদের জানতে চাওয়া স্বাভাবিক—কোনো বড় ভূমিকম্প হবার অনেক আগে থেকেই ঐ অঞ্চলে কোনো বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পায় কি না, —যাতে ভূমিকম্প সম্পর্কেও আমরা কিছু ভবিষ্যদ্বানী করতে পারি। অবশ্য, কিছু কিছু ব্যাপারে আমরা এখনই সাব-ধান হবার সুযোগ পেয়েছি ; যেমন—ফল্ট্‌এর ব্যাপারে। ওগুলো যে নিছক ফাটলমাত্র নয়, তার চেয়ে অনেক গভীর তাৎপর্যের জিনিস, এবং ভবিষ্যতে ওসব এলাকায় খুব বড় ভূমিকম্প ঘটার সম্ভাবনা, —এসব বুঝতে পেরে সাবধান হবার সুযোগ পাওয়া গেছে। এই বড় ভূমিকম্পগুলোকে অঙ্কুরে বধ করা যায় কিনা, তা'ও ভাবা হচ্ছে। এইসব ফাটলে চট্‌ করে ধস্ নামে না ; কারণ—ফাটলের মুখের ঘর্ষণজনিত বল এত বেশী (কারণ—ফাটলের ভিতরটা খুবই এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো এবং কঠিন) যে দীর্ঘকাল অবধি উপরের অঞ্চলের জমি ধ্বসে পড়তে পারে না। কোনো পিচ্ছিল জিনিস ঐ ফাটলে চালিয়ে যদি ভিতরের ঘর্ষণ কমিয়ে দিতে পারলে গোড়াতেই অনেকগুলো ছোটখাট ভূমিকম্প হয়ে যাবে এবং বড়ো ভূমিকম্পের সম্ভাবনা নষ্ট হবে। প্রস্তাব এসেছিল—বিখ্যাত স্যান্ অ্যান্ড্রিয়াস্ ফল্ট্‌এর ভিতরটা জলে ভর্ত্তি ক'রে দেওয়া হোক। তাতেই যথেষ্ট কাজ

হবে।* —কিন্তু, অত লম্বা এবং গভীর একটা ফাটলে জল ভরতে যা খরচ হবে তা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষেও সহনীয় নয়। সুতরাং বিকল্প ব্যবস্থার কথা ভাবা হচ্ছে। —কিন্তু, ফল্ট এর প্রকাশিত সাবধানী সংকেত বেশী জায়গায় নেই ; অথচ ভূমিকম্প হয় বহু জায়গায়। সুতরাং, কোনো সাধারণ বিপদ-সংকেত আছে কি না, তা খোঁজা হচ্ছে বিশেষভাবে। এক-এক ক্ষেত্রে এক-এক রকমের সংকেত পাওয়া যাচ্ছে প্রায়ই ; কিন্তু, কোনো সাধারণ সংকেতের কথা জানা না গেলে ভবিষ্যদ্বাণীর সুবিধে হচ্ছে না। ১৯৬৪ সালে আলাস্কার ভূমিকম্পের অল্প আগে ঐ অঞ্চলের ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের আকস্মিক ওলোট-পালট হয়েছিল। অন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার বিদ্যুৎ-চমকের কথাও শোনা গেছে। পৃথিবীর গভীরে যদি কোয়ার্জ (quartz) স্ফটিক থাকে, তবে পৃথিবীর চলমান স্তরের চাপ লেগে তাতে যথেষ্ট বিদ্যুতের সঞ্চার হ'তে পারে। উজ্‌বেকিস্থানে দু'টো ভূমিকম্পের আগে ঐ অঞ্চলের কুয়োর জলে তেজস্ক্রিয় র‍্যাডন্ গ্যাসের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা গিয়েছিল। কোথাও কোথাও আবার ভূমিকম্পের কয়েক ঘণ্টা, এমন কি—কয়েক বছর, আগে ঐ অঞ্চলের জমি উঁচু হয়ে উঠতে দেখা গেছে। জাপানে একবার একটি বন্দরের সব জল নাকি গড়িয়ে সমুদ্রে চ'লে যায়, এবং স্রেফ্ কাদার চরা প'ড়ে থাকে কয়েক ঘণ্টা। তার-পরেই সমুদ্র থেকে ভূমিকম্পজাত বিশাল, আততায়ী তরঙ্গ ছুটে আসে। ……সম্প্রতি অনেকগুলো গবেষণা-সংস্থা তৈরী হয়েছে এইসব লক্ষ্মণগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার বিবেচনা করার জন্য। আশা করা অসঙ্গত নয়, অদূর ভবিষ্যতে এর কিছু বড় সুফল মানুষ পেতে পারবে।

---

* ক্যালিফোর্ণিয়ার ভবিষ্যৎ-ক্ষতির পরিমান হিসাব ক'রে বলা হয়েছে যে—কয়েক শো' কোটি ডলারের ক্ষতি হবে ; লাখ দশেক মানুষও মারা যেতে পারে। ১৯৭৩ সালে টেলিভিসনে একটা ডকুমেণ্টারী ছবিও দেখানো হয়—'যে শহর মৃত্যুর অপেক্ষায়'! বলা বাহুল্য, এই হতভাগ্য শহর স্যান্ ফ্রান্সিস্কো!

পরবর্ত্তী পাঠ নির্দেশিকা

আলোচ্য বিষয়ে বহু বই ইদানীং বা'র হয়েছে। সহজবোধ্য কয়েকটিমাত্র বইয়ের কথা এখানে বলা হ'ল।

অল্প পরিসরে একটি পূর্ণাঙ্গ এবং মোটামুটি সুখপাঠ্য আলোচনা—

Continental Drift—Tarling and Tarling (Penguin, 1972)

যাঁরা প্রচুর সময় দিতে পারবেন, তাঁদের জন্য সুখপাঠ্য কিন্তু বিস্তৃত আলোচনা :

Continents in Motion—W. Sullivan (Macmillan, 1974).

বিজ্ঞানীদের ব্যক্তিগত জীবনের নানা ঘটনার সমাবেশে বইটি বিশেষ উপভোগ্য। আরেকটু পরিণত, যদিও সহজবোধ্য, আলোচনা Understanding the Earth—Gass, Smith ও Wilson সম্পাদিত (Cambridge, 1971)

এই বইতে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই নামেই আরেকটি জনপ্রিয় বই আছে। পাঠক সাবধান হবেন।

ভূ-বিজ্ঞান সম্পর্কে সাধারণভাবে যাঁরা কৌতূহলী তাঁদের জন্য —

Principles of Physical Geology—Arthur Holmes (Nelson, 1965)

পাহাড়ের জন্ম ও বিবর্তন সম্পর্কে আগ্রহী পাঠকের জন্য

Book of the High Mountains—Lowell Thomas (Simon & Schuster, 1964)

সাধারণ পাঠকের জন্য নয় ; অগ্রসর পাঠকের জন্য—

Continental Drift, Sea Floor Spreading and Plate Tectonics —Runcorn ও Tarling সম্পাদিত (Academic Press, 1972)

শ্রীপ্রসাদ সেনগুপ্ত শুধু যে বিজ্ঞানের একজন উৎসাহী ছাত্র এবং সফল অধ্যাপক তা'ই নন বিজ্ঞানকে সহজ ও সরসভাবে সাধারণ পাঠক-পাঠিকা, বিশেষ করে তরুণ বিদ্যার্থীদের কাছে পৌঁছে দিতে আগ্রহী। তাঁ'র ভাষা ও তথ্যালোচনা লক্ষ্য করলেই আমাদের এই উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করা যা'বে।

গ্রন্থকার বর্তমান সময়ে কুচবিহার আচার্য বি. এন্. শীল কলেজে পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপনায় ব্যাপৃত।

আরো বই

মণ্ডল, গোবিন্দচন্দ্র	—	অর্থনৈতিক উন্নয়ন	১০ ০০
লালওয়ানী, কে সি.	—	কেইনসোত্তর অর্থশাস্ত্র (এ)	১৫ ০০
মুখোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রনাথ	—	ব্যবহার বিজ্ঞান বাংলায় এ বিষয়ে এই প্রথম ও ভালো বই।	১৬ ০০
,, ডাঃ মিহির কুমার	—	জমি ও ফসল	৬ ০০
সেন, অমলেন্দু	—	জীব অভিধান	১০ ০০
ভট্টাচার্য, ডঃ এ. কে.	—	চিকিৎসা নিষ্কর্ষ	৫ ০০
মজুমদার, সুবোধকুমার	—	হীট্‌ট্রিটমেণ্ট মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর এটি একটি রোমাঞ্চহীন নীরস শুষ্ক বিষয়। একজন হীট্‌ট্রিটারের কাছে বাংলা ভাষায় লেখা গ্রন্থটি একটি সম্পদ বিশেষ।	৫ ০০
ডাঃ বাগচী, বৃন্দাবনচন্দ্র	—	আয়ুর্বেদে মনোদর্শন	১৫ ০০
ডাঃ দাশগুপ্ত, সুখেন্দু ভূষণ	—	স্বাস্থ্যরক্ষা ঃ শৈশব ও বার্দ্ধক্য	৪ ০০
সেন, অলক ও বসু, বিমল	—	যতদিন সূর্য	১০ ০০
বসু, শচীন্দ্রনাথ	—	মানুষের আগে	১০ ০০